পরাজিত ভারতসম্রাট

[ঐতিহাসিক নাটক]

সঞ্জীবন দাস

সুপ্রসিদ্ধ চিত্তরঞ্জন অপেরায়
ও
সুপ্রসিদ্ধ ক্যালকাটা অপেরায় অভিনীত

নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

সদ্য-প্রকাশিত

যাত্রার নাটক :

প্রকাশক :

এন. তালুকদার

বিরাটি, ২৪ পরগণা

দশ টাকা

মুদ্রক :

নিমাইচরণ ঘোষ

ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস

১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান স্ট্রীট

কলিকাতা-৬.

যার সবকিছুর বিনিময়ে আজ আমি সুধী দর্শক ও

পাঠকমণ্ডলীর কাছে নাট্যকার বলে পরিচিত

সেই স্নেহধন্যা সহধর্মিনী

শ্রীমতীসন্ধ্যা দাস [মণিমালা]-র

হাতে তুলে দিলাম আমার এই

পরাজিত ভারতসম্রাট।

—সঞ্জীবন দাস

নাট্যকারের কথা

নাটক জাতির জীবনে শিক্ষার দক্ষ দর্পণ বললে ভুল হয় না, আর জীবন্ত বেদগ্রন্থ বললেও অন্যায় হয় না। আমার "পরাজিত ভারতসম্রাট" নাটকে পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্ম ইত্যাদি বহু কিছুই শিক্ষামূলক সামগ্রী রয়েছে। সর্বদা জানবেন, নাটক শুধু নাটকই, সেখানে ইতিহাসের কোন নামগন্ধ পর্যন্ত নেই, আছে শ্রোতার মনজয় করার মত মধুর সংলাপ—সংগীতের মাদকতা আর কাহিনীর জম-জমাট। যদিও নাটক রচনাকালে ইতিহাস পড়তে হয়, কেবল ছায়া নেওয়ার জন্য। তারপর লেখনীর আগায় যা সৃষ্টি হয়, যা ঘটনা ঘটে, সবই কেবল কিংবদন্তী মাত্র। তাই ভারতসম্রাট সিকিন্দার লোদীর সঙ্গে বাংলার নবাব আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শহীদনগরে যুদ্ধ বাধিয়ে তাঁকে পরাজিত করেছি, এসবই আমার কল্পনা মাত্র।

নাটকখানি কলিকাতার দুটি দলে অত্যন্ত যশের সহিত অভিনয় হয়েছে—চিত্তরঞ্জন অপেরা ও ক্যালকাটা অপেরায়। পরে আপনাদেরই বহু তাগিদার ফলে—নির্মল বুক এজেন্সীর স্বত্বাধিকার আমার অগ্রজ-প্রতিম মাননীয় শ্রীযুত নির্মলকুমার সাহা 'আবীর ছড়ানো মুর্শীদাবাদ'-এর পর আমার 'পরাজিত ভারতসম্রাট' নাটক বহু অর্থব্যয়ে পুস্তকাকারে ছেপে বের করেছেন। নাটক রচনাকালে আমার পরম বন্ধুবর মাননীয় বাবু ভট্টাচার্য (অন্যতম নট) এবং মাননীয় অরুণকুমার ভদ্র মহাশয় আমায় বহুভাবে সাহায্য করেছেন। তাই উপরোক্ত সকলের কাছেই আমি বিশেষভাবে ঋণী।

—নাট্যকার

আমাদের প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ যাত্রার নাটক

বৈশাখী ঝড় | অনিল দাস

সুপ্রসিদ্ধ 'কালিকা নাট্য কোম্পানীর' যশের মুকুট।...শান্তির সাম্রাজ্যে কে বইয়ে দিলে দুরন্ত বৈশাখী ঝড়? কে ঐ নররাক্ষস, যে সিংহাসনের লোভে সৃষ্টি করলো রক্তের নদী? কার মহত্বে স্তম্ভিত হয় অগণিত প্রজার দল? আরও বহু প্রশ্নের জবাব পাবেন এই নাটকে।

ফাঁসির মঞ্চে | আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়

'জনতা অপেরায়' অভিনীত দেশাত্মবোধক নাটক। অন্যায়-অবিচারের কোন প্রতিবাদ নেই। প্রতিবাদ করলেই মৃত্যু। অপূর্ব সৃষ্টি।

চৌধুরী বাড়ীর বৌ | জি. সি. ভট্টাচার্য

চৌধুরী বাড়ীর বৌ শেফালী। ঘরোয়া কাহিনী অবলম্বনে চমৎকার নাটক। নাটকখানি যে-কোন ক্লাব অভিনয় করে সুনাম পেতে পারে।

নীচুতলার মানুষ | রঞ্জন দেবনাথ

টাকার লোভে বাপ বিক্রি করে দিলে তার ছেলেকে। কিন্তু তবুও তার দৈন্যদশা ঘুচলো না—অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরলো দুর্ভাগ্য। সেই বিক্রিত ছেলে হলো ম্যাজিস্ট্রেট। তারপর?

আমরাও মানুষ | রঞ্জন দেবনাথ

শিক্ষিত বিবেকবান যুবক বিনয় আজ ওয়াগন-ব্রেকার—সভ্য সমাজের আওতা থেকে সরে এসেছে বিবেকহীন সমাজে। কিন্তু কেন? নূপুরকে সে ভালবাসতো, অথচ সেই নূপুরের সিঁথির সিঁদুর সে মুছিয়ে দিল কেন? ঘরোয়া পরিবেশে চমৎকার নাটক।

চরিত্র-পরিচয়

—পুরুষ—

হোসেন শাহ	...	...	বাংলার নবাব।
ভাবনা কাজী	...	...	ঐ দেওয়ান।
চাঁদ কাজী	...	...	ঐ নাজির।
হুকুম আলি	...	...	ঐ বান্দা।
পুরন্দর খাঁ	...	...	ঐ উজির।
সাহেব আলি	...	...	সাহসপুরের চাষী।
রমজান	...	...	ঐ পালিত পুত্র।
জালিম কাজী	...	...	ঐ থানাদার [ভাবনা কাজীর ভ্রাতা]
প্রণয়কুমার	...	...	দীঘলহাটির যুবরাজ।
রামু ঠাকুর	...	...	ঐ প্রজা।
কানাই	...	...	ছদ্মবেশী কৃষ্ণ।
গোবিন্দ	...	...	ভবঘুরে।
সিকিন্দার লোদী	...	...	ভারতসম্রাট।
বৈরাম	...	...	ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
রহমৎ খাঁ	...	...	ঐ সিপাহশালার।

হাতেম আলি, রক্ষী।

—স্ত্রী—

বিজলীবাঈ	...	...	লাখনৌয়ের বাঈজী।
আলেয়া	...	...	সাহেব আলির কন্যা।
নিয়তি	...	...	রামু ঠাকুরের ভগ্নি।

———

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সাহেব আলির বাড়ি

সাহেব আলির প্রবেশ।

সাহেব। না-না-না, এ কিছুতেই হতে পারে না। অন্ততঃ আমি বেঁচে থাকতে আমার বেটিকে একটা মাতাল লম্পটের হাতে তুলে দেবো না—কিছুতেই না।

আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। বাপজান—একি, তোমার চোখ লাল কেন?

সাহেব। না-না, ও কিছু না রে বেটি, কিছু না। আসতে আসতে হঠাৎ চোখে যেন কি একটা পড়ে গেল। তাই—

আলেয়া। কথাটা আমার কাছে লুকোচ্ছ কেন বাপজান?

সাহেব। না রে বেটি, না।

আলেয়া। আবার ঝুট বাৎ? তুমি না মুসলমান? কোরান শরিফ পাঠ না করে তুমি না কোনদিন পানি পর্যন্ত খাওনি? তোমার কোরানে কি এই কথা লেখা আছে বাপজান, যে, বেটা-বেটির কাছে ঝুট বাৎ বলতে হয়?

সাহেব। আলেয়া!

আলেয়া। আগে সত্যি কথা বল—কি হয়েছে? না হলে আমি কিন্তু আজ পানি পর্যন্ত ছোঁব না। কি, বলবে না তো? বেশ, এই আমি চললুম—[প্রস্থানোদ্যতা]

সাহেব। বেটি আলেয়া—

আলেয়া। বল আগে—কি হয়েছে?

সাহেব। একটা বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছি রে বেটি।

আলেয়া। কি এমন দুশ্চিন্তায় পড়েছ, আমার কাছে বল, আমি যদি তার কিছু সুরাহা করতে পারি—

সাহেব। না রে বেটি না, তার যে আর কিছুই করার নেই।

আলেয়া। কথাটা কি তাই বল না!

সাহেব। তবে শোন, আজ থেকে তেরো বছর আগে যখন তোর আম্মা মারা যায়, তখন তোদের দুটিকে নিয়ে আমি বড় বিপদে পড়েছিলুম। তাই বাড়িতে তোর নানীকে নিয়ে এসে রাখলুম।

আলেয়া। তারপর?

সাহেব। হঠাৎ একসময় আমার অর্থের অভাব দেখা দিল। একে কুটুম মানুষ, তায় তোর নানী বলে কথা! তাই তাকে অভাবটা জানতে না দিয়ে, দেওয়ান সাহেবের কাছ থেকে দু'শো টাকা কর্জ করেছিলুম। আর আল্লার কিরে খেয়ে বলেছিলুম, তোর সঙ্গে তার ভাই জালিমের সাদি দেবো।

আলেয়া। বাপজান! আমি যে ছোটবেলা থেকে—

সাহেব। জানি রে বেটি, আমি সব জানি। তাই তো জেনে-শুনে একটা মাতাল লম্পটের হাতে তোকে তুলে দিতে আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।

আলেয়া। কিন্তু তোমার আল্লার কিরে—

সাহেব। মাথায় থাক।

আলেয়া। তুমি যে গোঁড়া মুসলমান—

সাহেব। জাহান্নামে যাক।

আলেয়া। কিন্তু তোমার জবান—

সাহেব। ঝুট্ হোক। তবু জেনেশুনে বাপ হয়ে বেটির সর্বনাশ আমি করতে পারবো না। তার জন্যে যদি আমার মাথায় খোদার কহর নেমে আসে, আমি হাসতে হাসতে তা মাথা পেতে নেবো, তবু পারবো না—

নেপথ্যে ভাবনা। সাহেব আলি মিঞা, বাড়ি আছ? সাহেব আলি--

সাহেব। ওই—ওই শয়তানটা এদিকেই আসছে। যা বেটি, তুই বাড়ির ভেতর যা।

আলেয়া। যাচ্ছি। তবে দেখো বাপজান, দেওয়ান সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে যেন তোমার বেটির ভবিষ্যতের কথা ভুলে যেও না। [প্রস্থান।

চাবুক হাতে ভাবনা কাজীর প্রবেশ।

ভাবনা। কই হে সাহেব আলি—

সাহেব। আরে আসুন—আসুন। আজ আমার কি জোর নসীব, স্বয়ং দেওয়ান সাহেব আমার গরীবখানায়! একি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন—বসুন। ওরে ও আলেয়া! জলদি মোড়াটা দিয়ে যা, এক বদনা পানি নিয়ে আয়।

ভাবনা। থাক, অত মেহমানদারীর প্রয়োজন নেই। এখন বল— তোমাকে বারবার এত্তেলা দেওয়া সত্ত্বেও তুমি আমার কাছারিতে হাজির হওনি কেন?

সাহেব। এত্তেলা? কই, আমি তো কোন এত্তেলা পাইনি জনাব!

ভাবনা। ও—পাওনি তাহলে? থাক, এখন বল—তুমি খাজনা দাওনি কেন?

সাহেব। আমার তো খাজনা বাকী নেই হুজুর!

ভাবনা। আচ্ছা তা না হয় হলো। এখন বল, কবে সাদির দিন ঠিক করলে?

সাহেব। সাদি? কার সাদি হুজুর?

ভাবনা। কেন, জালিমের সঙ্গে তোমার বেটির?

সাহেব। না কাজী সাহেব, আমার বেটি এ সাদিতে নারাজ।

ভাবনা। সাহেব আলি! আমার কথার বেহিসাবি জবাব দিও না।

সাহেব। কিন্তু হুজুর—

ভাবনা। জানি তুমি গরীব। তোমার বেটিকে কোনদিন ভাল একটা শাড়িও কিনে দিতে তুমি পারনি। তাই বলে তোমার অধিকারটা তো লোপ পেয়ে যেতে পারে না।

সাহেব। বুঝলাম না।

ভাবনা। বুঝিয়েই বলছি। সে তোমার বেটি, তুমি তার বাপজান। যার সঙ্গেই তার সাদি দাও, সেটা তোমার মর্জি। তাছাড়া বেটা-বেটির মতলব নিয়ে যদি তাদের সাদির আয়োজন করতে হয়, তার আগে তোমার মত বাপজানদের কবরে যাওয়াই উচিত।

সাহেব। দেওয়ান সাহেব!

ভাবনা। শোন। জালিম শুধু আমার ভাই-ই নয়, সে এই সাহসপুরের থানাদার। ইচ্ছা করলে—

সাহেব। আমার বেটিকে জোর করেও সাদি করতে পারে।

ভাবনা। তা তো পারেই। কিন্তু আমি তোমাকে সেকথা বলছি না—

সাহেব। তবে?

ভাবনা। জালিমের সঙ্গে তোমার বেটির সাদি হলে তার জিন্দেগীটা বেশ সুখেই কাটবে। এই পচা পল্লীর নোংরা পরিবেশ ত্যাগ করে তোমার ভাঙা মঞ্জিল ছেড়ে সে উঠবে খাপসুরৎ ইমারতের তোয়াজী খাসমহলে। ছেঁড়া শাড়ি পরে, কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে, আধপেটা খেয়ে আর দিন কাটাতে হবে না। হীরা-জহরতের জৌলুষে তার সর্বাঙ্গ ঝিলমিল করবে। রেশমী পোষাক পরে কোপ্তা কাবাব পোলাও খেয়ে আনন্দে হাসির ফোয়ারা ছোটাবে। তখন আর তাকে কেউ সাহেব আলির বেটি আলেয়া বলতে সাহসী হবে না, বলবে—বেগম সাহেবা।

সাহেব। কিন্তু আপনার ভাইয়ের তো সাদি দিয়েই দিয়েছেন।

ভাবনা। সে পুরুষ—হিম্মৎদার। একটা ছেড়ে তার দশটা সাদি হবে। সেকথা তোমার জানবার দরকার নেই।

সাহেব। দরকার আছে বৈকি। বাঃ রে, আমার বেটির সাদি, আর আমিই কিছুই জানতে চাইবো না?

ভাবনা। না।

সাহেব। তাহলে সাদিও আমি দিতে পারবো না।

ভাবনা। সাদি দেবে না?

সাহেব। না।

ভাবনা। কেন দেবে না?

সাহেব। আপনার ভাই একটা মাতাল—লম্পট—চরিত্রহীন।

ভাবনা। হুঁশিয়ার বেত্তমিজ! আমার সামনে আমার ভাইয়ের বেইজ্জতি গাইলে চাবুক মেরে সহবৎ শিখিয়ে দেবো। [চাবুক উত্তোলন]

আলেয়ার পুনঃ প্রবেশ।

আলেয়া। চাবুক মারাটা অত সহজ নয়। কারণ এটা হাবসী সুলতান মুজঃফর শার রাজত্ব নয় যে রাজকর্মচারীদের মর্জিতে আশমানে দিনে চাঁদ উঠবে।

ভাবনা। শোভানাল্লা! এংনি খাপসুরৎ! সাহেব আলি, এই বুঝি তোমার বেটি?

সাহেব। জী

ভাবনা। এ যে আশমানের হুরী। আমার ভাই জালিমের সঙ্গে চমৎকার মানাবে। যাক, তাহলে মোল্লা ডেকে সাদির ব্যবস্থা করিগে। [প্রস্থানোদ্যত]

আলেয়া। দাঁড়ান।

ভাবনা। কিছু বলবে?

আলেয়া। আপনিই বুঝি সেই দেওয়ান ভাবনা কাজী—যার নাম শুনলে মায়ের কোলে শিশুরা মুখ লুকোয়, নারীরা ভয়ে মূর্ছা যায়, আর—

ভাবনা। খামোশ! বেশী বাচালতা করলে চাবুকের ঘায়ে গায়ের চামড়াটা কালো করে দেবো।

সাহেব। আলেয়া—

আলেয়া। তুমি থাম বাপজান। এই দেওয়ান সাহেব—

ভাবনা। আজ তোমায় ক্ষমা করেই গেল, কারণ দুদিন পরে তুমি তার ভাইয়ের বেগম হবে, তাই।

আলেয়া। সে আশা ছেড়ে দিয়ে ইজ্জত বজায় রেখে বাড়ি ফিরে যান। নইলে নবাবের কর্মচারী বলে খাতির করতে পারবো না।

ভাবনা। কি করবে?

আলেয়া। কুকুর লেলিয়ে দেবো।

ভাবনা। তবে রে বাঁদীকা বাচ্চা!

[আলেয়াকে চাবুক মারিতে উদ্যত হইল ভাবনা কাজী। ঠিক সেই সময় সাহেব আলি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল ও চাবুক তাহার পিঠে পড়িল।]

সাহেব। দেওয়ান সাহেব!

ভাবনা। হুঁশিয়ার কমবক্ত! তোমার বেটি এতবড় বেয়াদব যে আমাকে বেইজ্জত করে! আমি তোমার ভিটেতে সর্ষে বুনব—ঘুঘু চরাব, তবেই আমার নাম ভাবনা কাজী।

সাহেব। মেহেরবানী করুন কাজী সাহেব। বেটি আমার ছেলেমানুষ, ওর বেয়াদবি মাফ করুন। আমি ওর হয়ে আপনার কাছে মাফ চাইছি।

ভাবনা। কোন কথা শুনতে চাই না। বল, তোমার বেটির সঙ্গে জালিমের সাদি দেবে কি না।

আলেয়া। এর পরেও?

ভাবনা। আমায় বারবার উত্তেজিত করো না। ঔরৎ বলে কিন্তু কারো অন্যায়কে আমি বরদাস্ত করতে শিখিনি।

আলেয়া। সেটা আপনাকে দেখেই অনুমান করা যায়।

ভাবনা। খামোশ!

সাহেব। আলেয়া, এমন কি হচ্ছে বেটি? আচ্ছা, তুই কি চাস আমি আত্মহত্যা করি?

আলেয়া। বাপজান!

সাহেব। চুপ কর বেটি, তুই চুপ কর। যা বলতে হয় আমি নিজেই বলছি। কাজী সাহেব, আপনি এখন কাছারিতে ফিরে যান।

ভাবনা। তাহলে সাদির কথাটা—

সাহেব। আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন।

ভাবনা। না, সময় আমি মোটেই দিতে পারবো না। আজই জালিমকে সঙ্গে এনে মোল্লা ডেকে আমি ওর সঙ্গে সাদির কলমা পড়াব।

সাহেব। সময় দেবেন না? বেশ, তাহলে মেহেরবানী করে শুনেই যান কাজী সাহেব—দোকানে বিষ আছে, ঘরে দড়ি-কলসীর অভাব নেই। তাও যদি না জোটে, আমি নিজেই ওকে গলা টিপে মেরে ফেলবো, তবু লম্পট জালিম কাজীর হাতে তুলে দেবো না।

ভাবনা। কি, এতনি বড়ি হিম্মৎ! আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে এনকার! মর তবে বাঁদীকা বাচ্চা! [সাহেব আলিকে পুনঃ পুনঃ চাবুকের আঘাত]

আলেয়া। [বাধা দান] দেওয়ান সাহেব!

ভাবনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এবার তোমাকেও—[আলেয়াকে চাবুক মারিতে উদ্যত]

গীতকণ্ঠে গোবিন্দ দাসের প্রবেশ।

গোবিন্দ।—

গীত

মেরো না—মেরো না চাবুক, মেরো না।
নিজের হাতে মরণ-কবর এমনি করে খুঁড়ো না॥
তোমরা দেশের শাসন শক্তি,
আমরা সবাই করব ভক্তি ;
মোহের বশে অন্ধ হয়ে, পাপের বোঝা বাড়িয়ো না॥

ভাবনা। কে তুই কমবক্ত?

গোবিন্দ। নিপীড়িত—নির্যাতিত বাংলার বুভুক্ষু প্রেতাত্মা।

ভাবনা। আমি তোকে কোতল করব শয়তান!

গোবিন্দ। কত কোতল আর করবে মিঞা? হাবসী ক্রীতদাস সিদিবদর খাঁ যেমন মুজঃফর শা নাম নিয়ে বসলো বাংলার মসনদে, বাঙালীরা যখন করল বিদ্রোহ, মামুদপুরের জঙ্গলে তার কবর হলো ; হোসেন শা বসল বাংলার মসনদে—তখন তুমি ছিলে সেই শয়তানের গোলাম। বাঙালীরা তোমায় চেনে। তাই বলছি—হুঁশিয়ার! ভুল করে বাঙালীর দেহে আঘাত করে আর নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না।

[প্রস্থান।

আলেয়া। ঠিক বলেছ গোবিন্দদা!

ভাবনা। চোপরাও হারামজাদি! আগে তোদের দুটোকে খতম করি, তারপর দেখব শয়তান গোবিন্দকে। [উভয়কে পুনঃ পুনঃ চাবুক মারিতে লাগিল]

সাহেব। কাজী সাহেব—কাজী সাহেব—

আলেয়া। কে আছ—বাঁচাও, রক্ষা করো!

ভাবনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [কশাঘাত]

ছুটিয়া হুকুম আলির প্রবেশ।

হুকুম। করেন কি—করেন কি জনাব! লোকটা মরে যাবে যে!

ভাবনা। মরুক! এ শয়তান কি করেছে জানিস?

হুকুম। কি করেছে হুজুর?

ভাবনা। এ আমায় বেইজ্জত করেছে।

হুকুম। তাই নাকি? সাহস তো কম নয়! সুলতানের দেওয়ান বলে কথা! দেখে কোথায় থর-থর করে কাঁপবে, হাজার হাজার সেলাম দেবে; তা নয়—বেইজ্জত!

ভাবনা। ওকে আমি—

হুকুম। আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না হুজুর। আপনি বরং মেহেরবানী করে কাছারিতে ফিরে যান। দেখি আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সাদিতে রাজী করাতে পারি কি না।

ভাবনা। বেশ, তাই দেখো—আমি কাছারিতেই চললাম। আর শোন, স্বেচ্ছায় যদি রাজী হয় ভাল; নইলে হাতে শৃঙ্খল পরিয়ে, চাবুক মারতে মারতে সুলতানের দরবারে হাজির করবে। আর এর বেটিকে—

হুকুম। আর কিছুই বলতে হবে না। আমি সব বুঝে নিয়েছি।

ভাবনা। ঠিক আছে। তারপর এই বেয়াদবকে ঠাণ্ডা কয়েদে ফেলে বুঝিয়ে দেবো যে, আমি সুলতান হোসেন শার পেয়ারের দেওয়ান ভাবনা কাজী। [প্রস্থান।

হুকুম। কি মিঞা, কি বুঝলে? এখন বল, জালিম কাজীর সঙ্গে বেটির সাদি দেবে, না ঠাণ্ডা কয়েদে যাবে?

আলেয়া। ভাইজান!

হুকুম। এই চুপ—চুপ থাক হারামজাদি। ওরে, আমি যে গোলাম। গোলামের তো বহিন থাকতে নেই।

সাহেব। হুকুম আলি!

হুকুম। চাচা! বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সবই শুনেছি, দূর থেকে সবই দেখেছি। তাই তোমায় বলি শোন—প্রয়োজনে তোমার বেটিকে গলায় কলসী বেঁধে পদ্মার পানিতে ফেলে দিও, তবু শয়তানের বাচ্চা ওই জালিম কাজীর সঙ্গে সাদি দিয়ে ওর জিন্দেগীটা কান্নার তুফানে ভরিয়ে দিও না।

সাহেব। তাহলে—

হুকুম। ভুলে যাচ্ছ কেন, এটা সুলতান হোসেন শার রাজত্ব। তার বিচারে কোন ভুল হয় না। চিন্তা করো না, আমি তোমাকে বন্দী করে দরবারে হাজির করব সত্যি, কিন্তু জান থাকতে তোমার এতটুকু ক্ষতি হতে দেবো না।

আলেয়া। ভাইজান! বাপজানের হাতে তুমি শৃঙ্খল পরাবে?

হুকুম। পরাবো বহিন। কারণ আমি যে হুকুমের গোলাম। তাই মালিকের হুকুম তামিল করতে আমি বাধ্য।

আলেয়া। যদি সেখানে গিয়ে কোন ক্ষতি হয়?

হুকুম। তোর ভাইজান জিন্দা থাকতে কারো হিম্মৎ হবে না তোর বাপজানের গায়ে কাঁটার আঁচড় দেয়। এসো চাচা—

[প্রস্থানোদ্যত]

আলেয়া। ভাইজান! [দুই চোখে জল আসিল]

হুকুম। কাঁদিসনে বহিন। ভয় কি রে! খোদার কসম, তোর কাছে আমি জবান দিয়ে গেলাম—প্রয়োজনে জান দেবো, তবু আমার চাচার বেইজ্জত কিছুতেই হতে দেবো না।

আলেয়া। বাপজান—

সাহেব। ভয় নেই বেটি, তোর ভাইজান যখন জবান দিয়ে যাচ্ছে—[আর বলিতে পারিল না, দুই চোখে জল ঝরিল]

আলেয়া। ওঃ—বাপজান!

হুকুম। এবার যেতে দে বহিন শুধু মনে রাখ, তোর ভাইজানের মুখের জবান সে জান দিয়েও রাখবে। এসো চাচা—[পুনঃ প্রস্থানোদ্যত]

আলেয়া। বাপজান—

সাহেব। খোদাকে ডাক বেটি, দীল ভরে শুধু খোদাকে ডাক।

[হুকুম সহ প্রস্থান।

আলেয়া। বাপজান—বাপজান! নিয়ে গেল, বিনা অপরাধে শয়তান ভাবনা কাজীর হুকুমে বাপজানকে আমার নবাব দরবারে বেঁধে নিয়ে গেল। ওঃ খোদা! কি বলে তোমায় ডাকতে হয় জানি না, কিভাবে তোমায় ভজতে হয় বুঝি না। তাই এমনি তোমার দরবারে মোনাজাত জানাচ্ছি, আমার বাপজানকে তুমি দেখো মালিক, আমার বাপজানকে তুমি দেখো।

[প্রস্থান।

— — —

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌড়ের দরবার

চাঁদ কাজীর প্রবেশ।

চাঁদ। মাথা নেবো—হাতে মাথা নেবো! আমি সুলতান হোসেন শার শ্বশুরজান বলে কথা! আমাকে দেখে তামাসা! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! যা মনে করেছে তাই! অত চালাকি চলবে না। মাথা নিয়ে তবেই নিস্তার।

পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। কার মাথা নেবেন নাজির সাহেব?

চাঁদ। যাকে সামনে পাব—তার।

পুরন্দর। সেকি!

চাঁদ। হ্যাঁ। আজ আমি মরিয়া। রাগে সর্বশরীর আমার থর-থর করে কাঁপছে।

পুরন্দর। দোহাই! উপস্থিত আপনার রাগটা একটু সামলে রাখুন। জাঁহাপনা দরবারে এলে তার কাছেই অভিযোগ করবেন।

চাঁদ। বয়ে গেছে অভিযোগ করতে। আমি চাঁদ কাজী, হোসেন শার শ্বশুর—আমি করবো অভিযোগ? না, কিছুই করবো না।

পুরন্দর। বেশ, তাহলে করবেন না।

চাঁদ। কি, করবো না? বলি কেন করবো না হে? কি মনে করেছ তুমি? তুমি মনে করেছ কি? তোমার এত ভয়টা কিসের হে বাপু? ওঃ—তুমিও বুঝি তামাসা কর?

পুরন্দর। তামাসা? রাধামাধব—

চাঁদ। রাধামাধব মানে? কে রাধামাধব? কোথায় থাকে? তার পরিচয়ই বা কি? কোন সাহসেই বা সে আমার সঙ্গে তামাসা করে? এসব কথা হোসেন এলে তুমি বলো, কেমন?

পুরন্দর। মানে, আপনি কি—

চাঁদ। ভয় হচ্ছে? হেঃ-হেঃ-হেঃ, এতদিনে আসল রোগ ধরা পড়েছে। দাঁড়াও—দেখাচ্ছি মজা! [প্রস্থানোদ্যত]

পুরন্দর। নাজির সাহেব!

চাঁদ। উঁ-হুঁ, কোন কথা নয়। আজ আগে তোমার মাথা নিয়ে তবে আমার নিস্তার।

পুরন্দর। নাজির সাহেব! আপনি—

চাঁদ। থামো থামো। অত সোহাগ করে আর না-জি-র সা-হে-ব বলে ডাকতে হবে না। শোন, একবার আমার সঙ্গে এসো তো হে।

পুরন্দর। কোথায়?

চাঁদ। জাহান্নামে।

পুরন্দর। সেখানে যেতে হয় আপনি একাই যান, আমার অত তাড়াতাড়ি সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা নেই।

নেপথ্যে নকীব। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মহান অধিপতি মীর্জা মহম্মদ আলি আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কুলি খান বা-হা-দু-র—

হোসেনের প্রবেশ ও সকলের অভিবাদন।

হোসেন। বাংলা—বাঙালী—বাংলার মসনদ জিন্দাবাদ। এই যে পুরন্দর খাঁ, কি সংবাদ বল।

চাঁদ। তার আগে আপনার কাছে আমার একটা আর্জি আছে।

হোসেন। পরেই শুনবো।

চাঁদ। ঠিক আছে, পরেই শোনাব।

হোসেন। পুরন্দর খাঁ—

পুরন্দর। জাঁহাপনা! বেনাপোলের রাজা রামচন্দ্র রায়, গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধি রায়, চম্পাহাটির রাজা দুরন্তবাহু, দীঘলহাটির রাজা প্রতাপরুদ্র রায় এবং অন্যান্য নগরের শাসকগোষ্ঠী একত্রিতভাবে একই আর্জিতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

হোসেন। কেন?

চাঁদ। করবেই তো। আমি চাঁদ কাজী, সুলতান হোসেন শার শ্বশুরজান, আমাকে কিনা লোকে তামাসা করে! একথা জানলে কে না দুঃখ প্রকাশ করবে শুনি?

হোসেন। আপনি থামুন।

চাঁদ। থামলুম।

হোসেন। হ্যাঁ—বল পুরন্দর খাঁ, তাদের আর্জির উদ্দেশ্য কি?

পুরন্দর। উদ্দেশ্য এই যে, হাবসী ক্রীতদাসরা এখনও সবাই বাংলা মুলুক ছেড়ে চলে যায়নি।

হোসেন। সেকি!

পুরন্দর। হ্যাঁ জনাব। তাদের দিনের আলোয় দেখা যায় না, অথচ রাতের অন্ধকারে তারা নগরে শহরে গ্রামাঞ্চলে অত্যাচার করে বেড়ায়।

হোসেন। তাই যদি হয়, এই মুহূর্তে সেনাপতি পরাগল খাঁকে আদেশ জানাও, যেখানে যে অবস্থায় যে-কোন হাবসী দেখবে, তাকে যেন কুকুরের মত গুলী করে মারে।

পুরন্দর। বেশ তাই হবে জনাব।

হোসেন। মন্ত্রী রূপ গোস্বামী কোথায়?

পুরন্দর। তিনি এখন গ্রন্থ লিখছেন।

চাঁদ। আর সনাতন গোস্বামী?

পুরন্দর। তিনিও তাই।

চাঁদ। মাসে মাসে কাঁড়ি কাঁড়ি আসরফি নেবে, আর কাজের বেলায় ফাঁকি। কেবল গ্রন্থই লিখছে। কে যে পড়ছে আর কে যে শুনছে তার ঠিক নেই। তুমি ওদের ওসব লিখতে নিষেধ করে দাও হোসেন।

হোসেন। তা কি পারি? আমার সোনার বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিক-ঐতিহাসিকরাই তো পরম গৌরবের সম্পদ। খোদার আশীষ মাথায় নিয়ে ওরা জন্মেছে এই দুনিয়ার বুকে। বাংলায় বাঙালীর জাতীয় সম্পদ সাংস্কৃতিক উন্নতির যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

পুরন্দর। জাঁহাপনা! উড়িষ্যা, মগধ ও বিহারের কিয়দংশ এখন আমাদের সম্পূর্ণ অধিকারে।

হোসেন। এর পরে আমাদের অভিযান কোথায় হবে জান পুরন্দর খাঁ?

পুরন্দর। কোথায় জাঁহাপনা?

হোসেন। আসাম—কোচবেহারে।

পুরন্দর। গোস্তাকি মাফ করবেন। তাহলে আপনার আশ্রিত হুশেন শাহ?

হোসেন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক—তুমি ঠিকই বলেছ পুরন্দর খাঁ। আমার আশ্রিত জৌনপুরের হুসেন শাহ আমার সাহায্যের আশায় অপেক্ষমান। দিল্লীর সুলতান বহলুল্ লোদীর আক্রমণে তিনি সারকী রাজ্য থেকে

আজ বিতাড়িত। আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি, দোস্ত বলে কছে টেনে নিয়ে জবান দিয়েছি। আশা দিয়েছি, তাঁর রাজ্যসীমান্তের নিরাপত্তার ভার আমার।

পুরন্দর। জাঁহাপনা—

হোসেন। আচ্ছা তুমি এখন এস পুরন্দর খাঁ। পরাগল খাঁকে আমার আদেশ জানিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে সাক্ষাৎ করবে। আমি মন্ত্রী রূপ গোস্বামীকে নিয়ে কিছুক্ষণ পরেই এ বিষয়ে আলোচনায় বসবো।

পুরন্দর। বেশ তাই হবে জাঁহাপনা। শুধুমাত্র পরাগল খাঁকে নয়, আমি সমগ্র রাজ্যে ঢোলসহরৎ করে জানিয়ে দিচ্ছি আপনার আদেশ।

চাঁদ। কারণ?

পুরন্দর। তাতে হাবসী দস্যুদের কানেও সংবাদ পৌছাবে। তারপর হয়তো জানের মায়ায় অনেকে এমনিতেই বাংলা ছেড়ে চলে যাবে।

হোসেন। তোমার সুবুদ্ধির আমি প্রশংসা করি পুরন্দর খাঁ। তবে যাও, ওই সঙ্গে আরও একটা কথা ঘোষণা করবে—যদি কেউ কোন হাবসীকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে আমার দরবারে হাজির করতে পারে, আমি তাকে আশাতীত ইনাম দেবো।

পুরন্দর। তাই হবে জনাবালি! প্রতিটি শহরে নগরে গ্রামাঞ্চলে আমি এখনই আপনার হুকুম অনুযায়ী ঢোলসহরৎ করে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি। [প্রস্থান।

হোসেন। হাবসী—হাবসী। ক্রীতদাসের দল কৃতজ্ঞতা ভুলে দস্যুতা করে বাঁচতে চায়। কিন্তু তারা জানে না যে, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাদের খোয়াব ভেঙে চুরমার করে দেবে।

চাঁদ। এরপর আমার কিন্তু একটা আর্জি আছে হোসেন।

হোসেন। এবার বলুন, কি আপনার আর্জি।

চাঁদ। তোমার কর্মচারীরা বলে, আমিও নাকি হাবসী ক্রীতদাস।

হোসেন। একথা আপনি নিজে শুনেছেন?

চাঁদ। শুনলে কি তার ধড়ে মাথা থাকতো? হাতে মাথা নিতাম। কেন, তুমি কারো মুখে শোননি?

হোসেন। না।

চাঁদ। আমি চাঁদ কাজী, বাংলার নাজির, তোমার শ্বশুরজান, আদিনার আব্বাজান, আমায় বলে কিনা হাবসী! বেটাদের আজ মজা দেখাবো। [প্রস্থানোদ্যত।

হোসেন। দাঁড়ান, মেহেরবানী করে যাবেন না।

চাঁদ। কেন?

হোসেন। আপনার চিকিৎসার প্রয়োজন। তাই বৈদ্য মুকুন্দ দাস আসছে।

চাঁদ। তোবা—তোবা! হিন্দু কাফেরের হাতে দাওয়াই খাবো?

হোসেন। তাতে জাত যাবে না।

চাঁদ। যাবে না মানে? আলবৎ যাবে, পাঁচশোবার যাবে। জান তো ওদের দাওয়াইতে কি থাকে? শূয়োরের খুন আর কাঁকড়া ভস্ম ছাড়া ওদের দাওয়াই-ই হতে পারে না।

হোসেন। তাই নাকি?

চাঁদ। তবে আর বলছি কি! তোমাকে তো বললে শুনবে না। যদি পার, ওই হিন্দু বৈদ্য মুকুন্দ দাসকে নোকরী থেকে ইস্তফা দাও।

ভাবনা কাজীর প্রবেশ।

ভাবনা। [অভিবাদন করিয়া] বান্দার হাজারো হাজারো সেলাম পৌঁছে মেহেরবান।

হোসেন। একি দেওয়ান সাহেব! সহসা দরবারে কেন?

ভাবনা। একটা বিশেষ জরুরী ব্যাপারে আসতে বাধ্য হয়েছি জাঁহাপনা।

হোসেন। জরুরী ব্যাপার?

ভাবনা। জী হজরৎ। সাহসপুরের এক দীন চাষী—নাম সাহেব আলি মোল্লা, এতবড় বেয়াদব যে পরপর তিন সনের খাজনা দেয়নি। শুধু তাই নয়, সমস্ত সাহসপুরের হিন্দু-মুসলমানকে একজোট করে সে নবাব শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়।

হোসেন। আমার বিশ্বস্ত দেওয়ান ভাবনা কাজী, একথা জানার পরেও সে বেয়াদবের কাঁধে মাথাটা এখনও বহাল তবিয়তেই আছে?

চাঁদ। তাকে তুমি এখনও কোতল করনি?

ভাবনা। জী না। আমি তাকে বন্দী করে এনেছি মেহেরবান।

চাঁদ। কই, কোথায় সেই শয়তান?

ভাবনা। কই হায়? বন্দী সাহেব আলি মোল্লা—

বন্দী সাহেব আলিকে লইয়া হুকুমের প্রবেশ।

হোসেন। যাও হুকুম আলি, বাইরে অপেক্ষা কর।

হুকুম। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

হোসেন। কি নাম তোমার?

সাহেব। সাহেব আলি মোল্লা।

হোসেন। সাকিম?

সাহেব। সাহসপুর।

হোসেন। পেশা?

সাহেব। লাঙ্গল চাষ।

হোসেন। তোমার বিরুদ্ধে দেওয়ান সাহেব যে আর্জি পেশ করেছেন তা সত্যি?

সাহেব। আর্জিটা কি, তাই তো আমি এখনও জানতে পারলাম না মালিক।

হোসেন। তুমি পরপর তিন সনের খাজনা দাওনি। উপরন্তু তামাম সাহসপুরের হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে গড়ে তোল কোন সাহসে?

সাহেব। এ আর্জি সম্পূর্ণ মিথ্যা হজরৎ।

চাঁদ। মিথ্যা?

হোসেন। তাহলে তোমার হাতে শৃঙ্খল কেন?

সাহেব। গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা। আজ থেকে তেরো বছর আগে আমার অভাবের দিনে দেওয়ান সাহেবের কাছ থেকে আমি দুশো আশরফি কর্জ নিয়েছিলাম, আর খোদার নামে কসম করে বলেছিলাম, আমার বেটি আলেয়ার সঙ্গে দেওয়ান সাহেবের ভাই জালিম কাজীর সাদি দেবো।

হোসেন। এ তো আনন্দের কথা।

সাহেব। অত আনন্দ আমার নসীবে সইবে না জনাব।

হোসেন। কেন?

সাহেব। দেওয়ান সাহেবের ভাই জালিম কাজীর সাদি হয়ে

গেছে। আর আমার বেটিও ছোটবেলা থেকে একজনকে খসম ভেবে পেয়ার করে আসছে।

হোসেন। তবুও তোমায় দেওয়ানের ভাইজানের সঙ্গে তোমার বেটির সাদি দিতেই হবে।

সাহেব। হয়তো দিতাম, কিন্তু—

হোসেন। কি ?

সাহেব। দেওয়ান সাহেবের ভাই মাতাল লম্পট চরিত্রহীন।

ভাবনা। হুঁশিয়ার বেয়াদব ! [চাবুক উত্তোলন]

হোসেন। দেওয়ান ভাবনা কাজী ! প্রকাশ্য দরবারে দাঁড়িয়ে আমার কোন বন্দীকে অপমান করাও যা- সুলতানের মাথায় পয়জার মারাও তাই।

ভাবনা। গোস্তাকি মাফ হয় হজরত।

হোসেন। সাহেব আলি মোল্লা—

সাহেব। মালিক !

হোসেন। সেদিন যখন তুমি জবান দিয়েছ, আজ তা তোমায় রক্ষা করতেই হবে।

সাহেব। জাঁহাপনা !

হোসেন। কোন কথাই আমি শুনতে চাই না। সাদি তোমায় দিতেই হবে। আমার আদেশ—

ভাবনা ও সাহেব। জনাব !

হোসেন। আদেশ যখন করেছি, সাদি তোমাকে দিতেই হবে। তবে কার সঙ্গে জান ?

সাহেব। কার সঙ্গে জনাব ?

হোসেন। এই দেওয়ান সাহেবের লম্পট মত্তপ চরিত্রহীন ভাই

জালিম কাজীর সঙ্গে নয়, সাদি দেবে তোমার বেটি ছেলেবেলা থেকে যাকে খসম ভেবে পেয়ার করে আসছে।

ভাবনা ও সাহেব। জাঁহাপনা!

হোসেন। যাও ভাই! সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহর বিচারে তুমি মুক্ত। [শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিল] এখন ঘরে ফিরে গিয়ে তুমি তোমার বেটির সাদির আয়োজন কর। যত অর্থ ব্যয় হবে, সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে তোমাদের এই সুলতান।

সাহেব। কিন্তু জাঁহাপনা! কেউ যদি বাধা দেয়?

হোসেন। তার স্থান হবে পাণ্ডুয়ার অন্ধকার কারাকক্ষে। সে যদি আমার কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীও হয়, তবুও তার রেহাই নেই।

সাহেব। জাঁহাপনা! আগে কখনও ভাবতে পারিনি যে আপনি এত মহৎ—এত উদার। তাই আজ আপনার এই দীন চাষা প্রজা জানিয়ে যাচ্ছে তা'র হাজার হাজার সেলাম—হাজার হাজার সেলাম।

[প্রস্থান।

ভাবনা। এটা কি হলো জনাব?

হোসেন। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহর বিচার।

চাঁদ। বাংলার মসনদে বসে এইভাবে বিচার করলে, তোমার কর্মচারীরা কিন্তু সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না।

হোসেন। কর্মচারীদের সন্তুষ্ট রাখতে আমি আমার অসহায় গরীব প্রজাদের ওপর অবিচার করতেও পারবো না।

ভাবনা। গোস্তাকি মাফ করবেন। এই নীতি নিয়ে যদি আপনি রাজ্য শাসন করেন, যারা আপনাকে একদিন ওই মসনদে বসিয়েছিল, তারাই হয়তো আবার আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে। নয়তো আবার আপনাকে হাত ধরে পথে নামিয়ে দেবে।

হোসেন। তাই যদি হয়—আবার আমি হাসতে হাসতে আমার পূর্বজীবনে ফিরে যাবো। আবার বেনাপোলের রাজা রামচন্দ্র রায়ের রাখালি করবো; তবু বাংলার শাসন ভার মাথায় নিয়ে ভুয়ো নবাব সেজে, আমার দীন-দুঃখী প্রজাদের মাথায় পয়জার তুলে দিতে পারবো না।

ভাবনা। জনাব!

হোসেন। মনে রেখো ভাবনা কাজী, শুধু আমীর-ওমরাহরাই আমায় এ নবাবী দেয়নি, ইলিয়াস শাহী বংশধর তথাকথিত সুলতান রুকনউদ্দিন বারবকের মৃত্যুর পর হাবসী ক্রীতদাস সিদিবদর খাঁ মুজঃফর শাহ নাম নিয়ে বসেছিল এই বাংলার মসনদে। সেদিন দারিদ্রোর দারুণ কশাঘাত সইতে না পেরে, আফগানিস্থানের শুষ্ক মরুভূমি ত্যাগ করে এসে বাংলামায়ের শ্যামল কোলে স্থান পেল তার এক অবাঞ্ছিত সন্তান—নাম তার হোসেন শাহ।

ভাবনা। জনাব!

হোসেন। কিন্তু হঠাৎ যেন এক নিশীথের করুণ কান্নায় ভেঙে গেল আমার ঘুম। চোখ মেলে চেয়ে দেখলাম—সম্মুখে এক নারী। আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম কে তুমি নারী? বললে, 'আমি তোর মা—নির্যাতিতা বাংলা-মা। বিদেশী হাবসী দস্যুর অত্যাচারে বাংলার আজ চরম দুর্দিন। বাংলার আকাশ-বাতাস বিষাক্ত, বাংলার জমিন ভারাক্রান্ত, বাঙালীরা জর্জরিত। তুই আমাকে রক্ষা কর। আমার হাতের শৃঙ্খল খুলে দে।' আমিও কথা দিলাম, মাগো, জান দিয়ে রক্ষা করবো তোমার মান-সম্ভ্রম।

ভাবনা। তারপর?

হোসেন। দেখলাম, বাংলার ঘরে ঘরে তখন জলে উঠেছে বিদ্রোহের

আগুন। আমিও বাংলামায়ের আশীষ মাথায় নিয়ে, দীন-দুনিয়ার মালিক মেহেরবান খোদাকে স্মরণ করে—বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব নিয়ে হাজির হলাম শয়তান মুজঃফর শাহর সম্মুখে।

চাঁদ। তারপর ?

হোসেন। অসংখ্য বাঙালী বীর জোয়ানের সহায়তায় মুজঃফর শাহকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে মামুদপুরের জঙ্গলে কবর দিয়ে আমি হলাম বাংলার সুলতান। তাই আমার এ সুলতানী কারো দয়া বা অনুগ্রহের দান নয়, এ আমার হিম্মতের পুরস্কার।

[প্রস্থান।

জাবনা। কি! অপমান—বেইজ্জত ? আচ্ছা, যদি দিন পাই—

চাঁদ। কিছুই করতে পারবে না মিঞা! এ বড় শক্ত ঠাঁই। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কাঁচা আল দিয়ে পথ চলে না। যদি পার এখনও নিজেকে পরিবর্তন কর। [প্রস্থানোদ্যত]

জাবনা। যদি না করি ?

চাঁদ। বাংলার সুলতান তোমাকে ক্ষমা করলেও, বাঙালীরা কোনদিন তোমায় ক্ষমা করবে না।

[প্রস্থান।

জাবনা। এরা সবাই শয়তান। কিন্তু জানে না যে, কেউটে সাপ নিয়ে খেলা করলে, তার ছোবলও সহ্য করতে হয়। বহুত আচ্ছা! বান্দা—

হুকুমের পুনঃ প্রবেশ।

হুকুম। বান্দা হাজির হুজুর!

জাবনা। এখনই তোকে একবার লাখনৌ যেতে হবে।

হুকুম। কেন জনাব?

ভাবনা। শুনেছি সেখানে এখন এক খ্যাতনামা সুন্দরী বাঈজী আমদানী হয়েছে।

হুকুম। তাই নাকি?

ভাবনা। হ্যাঁ, তার নাম বিজলীবাঈ।

হুকুম। বিজলীবাঈ হোক আর মেঘলাবাঈ হোক, তাতে আমাদের কি!

ভাবনা। প্রয়োজন আছে। যে কোন উপায়েই হোক, তাকে তুই বাংলায় হাজির করবি।

হুকুম। কেন জনাব?

ভাবনা। জানতে চাস না। হুকুম তামিল করে এলে মোটা বখশিস পাবি। যা, মনে রাখিস—তাকে আমার চাই-ই চাই। আর যদি হাজির করতে না পারিস তাহলে আমি তোকেই কোতল করবো।

হুকুম। তার কোন প্রয়োজন নেই জনাব। আমি বরং এখনই তৈরী হয়ে যাচ্ছি। আপনার হুকুম তামিল করতে এ বান্দার জান কবুল।

[প্রস্থান।

ভাবনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! শয়তান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ! এইবার তোমার মারণাস্ত্র আমদানী করছি হুকুম আলিকে দিয়ে। এবার আমার বেইজ্জতির চরম প্রতিশোধ নেবো। তবেই আমার নাম দেওয়ান ভাবনা কাজী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সাহেব আলির বাড়ির সম্মুখস্থ পথ

লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী পরিহিত অর্ধোম্মাদ রমজানের প্রবেশ।

রমজান। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কোথায় পালাবে তুমি ঠাকুর? আমি তোমাকে চিরদিন রেখে দেবো আমার অন্তর-মন্দিরে—ঠিক এমনি করে জড়িয়ে ধরে। [আপন দেহ দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া বসিল]

চাবুক হস্তে মদমত্ত জালিম কাজীর প্রবেশ।

জালিম। খামোশ বেয়াদব! [রমজানকে চাবুক মারিল]

রমজান। [উঠিয়া] ওঃ ঠাকুর!

জালিম। হুঁশিয়ার কমবক্ত! বল—কে তুই?

রমজান। আমি রমজান।

জালিম। রমজান? তাহলে তো দেখছি তুই মুসলমানের বাচ্চা।

রমজান। তা তো জানি না, তবে আমিও মানুষ।

জালিম। মানুষ! ইসলামের রাজত্বে বাস করে সাচ্চা মুসলমানের বাচ্চা হয়ে খোদার নাম ভুলে গিয়ে কোন হিসাবে তুই পথের মোড়ে বসে ওই কাফের হিন্দুর ঠাকুরের নাম করছিস বেয়াদব?

রমজান। হিন্দুর ঠাকুর—কাফের?

জালিম। আলবৎ। খড়-মাটির পুতুলগুলো তাছাড়া আর কি!

রমজান। না গো না, ও তোমার ভুল ধারণা।

জালিম। ভুল?

রমজান। নিশ্চয়ই। যে খোদা, সেই তো ভগবান।

জালিম। চোপরাও কমবক্ত ! যে খোদা, সে কখনও ভগবান নয়।

রমজান। ভগবান নয় ?

জালিম। না। শোন, ভগবান নামে কেউ কোনদিন ছিল না— আর আজও নেই।

রমজান। আছে গো, আছে। এই বাংলামায়ের সন্তান শ্রীচৈতন্য-দেবও হিন্দু। সেও তার ঠাকুরের নাম-গানে তামাম বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে মাতিয়ে দিয়েছে। সত্যনারায়ণ আর পীর মহম্মদের দুই নাম একত্রিত করে, সে যে সত্যপীর নামে দীন-দুনিয়ার মালিককে পেয়েছে। তাই তো হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, সারা বাংলাটাকে আজ মাতিয়ে তুলেছে।

জালিম। তুলুক। ওসব বেয়াদবি আমি বরদাস্ত করবো না। মনে রেখো, আমি সাহসপুরের থানাদার। মুসলমান হয়ে হিন্দুর দেবতাকে ডাকা চলবে না—এই আমার হুকুম।

গীতকণ্ঠে গোবিন্দর প্রবেশ।

গোবিন্দ।—   গীত

মিছে কেন হুকুম বলে কর চিৎকার।
যে যারে ভজিতে চায়, বাধা কেন দাও বারে-বার ॥
(ওগো) জল আর পানি তফাৎ কত,
খোদা-ভগবান ফারাক যত,
একই খোদা, একই মালিক তিনি নিরাকার ॥

জালিম। চোপরাও বেয়াকুব ! বল—কে তুই ?

গোবিন্দ। মানুষ।

জালিম। আমি তোকে চাবুক মারব শয়তান !

গোবিন্দ। তাহলে আলাউদ্দিন হোসেন শার চাবুকও তোমার দেহ রাঙিয়ে দেবে। হুঁশিয়ার থানাদার জালিম কাজী ! মনে থাকে যেন, তোমরা যার পায়ের তলা থেকে এঁটো রুটি তুলে নিয়ে হাজার হাজার সেলাম দাও, আমি তার দোস্ত গোবিন্দ দাস। হুঁশিয়ার—বহুৎ বহুৎ হুঁশিয়ার ! [পূর্ব গীতাংশ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

রমজান। ঠিক—ঠিক বলেছে গোবিন্দদা। খোদা-ভগবান ফারাক কত, জল আর পানি তফাৎ যত।

জালিম। তবে রে বাঁদীকা বাচ্চা ! আমায় বেয়াকুব বানাতে চাস ? মর—মর তবে। [রমজানকে পুনঃ পুনঃ চাবুকের আঘাত]

রমজান। ওঃ—আঃ—ঠাকুর—ঠাকুর ! তোমার দেওয়া প্রাণ তুমিই রক্ষা কর দয়াময়, তুমিই রক্ষা কর।

সহসা আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। জালিম কাজী !

জালিম। শোভানাল্লা ! এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই পানি !

আলেয়া। তুমি রমজানকে চাবুক মারছ কেন ? কি ওর অপরাধ ?

জালিম। অপরাধ অসংখ্য। পবিত্র ইসলাম ধর্মের অপমান করে কাফের হিন্দু-ঠাকুরের নাম-গান করছে।

আলেয়া। তাতে হয়েছে কি ?

জালিম। আমাদের ইমানের অপমান হচ্ছে। তাই আমি ওকে—

আলেয়া। চাবুক মেরে সহবৎ শিক্ষা দিচ্ছ। তাই না কাজী সাহেব ?

জালিম। হ্যাঁ, তোমার কথাই সত্যি।

আলেয়া। সাবাস—সাবাস ইমানদার!

জালিম। আলেয়া! তুমি জান না, খানদান ইসলামী হয়ে হিন্দুর ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করলে—

আলেয়া। দোজাকে যেতে হয়, তাই না?

জালিম। হাদিস কোরান তো উচ্চকণ্ঠে তাই ঘোষণা করেছে। তাই আমি আবার বলছি, আমার থানা এলাকার মধ্যে যদি কোন বেয়াদব এইভাবে বেয়াদবি করে, তাকে আমি কিছুতেই রেহাই দেবো না।

রমজান। ওঃ—ঠাকুর!

জালিম। খবরদার কাফের কুত্তা! [কশাঘাতে উদ্যত]

আলেয়া। [বাধা দিয়া] থানাদার!

জালিম। আবার যদি ও নাম উচ্চারণ করিস, চাবুকের ঘায়ে সারা দেহের চামড়া তুলে নিয়ে আমার পয়জার বানাবো।

আলেয়া। বেশ, তাই হবে থানাদার। মেহেরবানী করে আমায় একপক্ষকাল সময় দাও, আমি তোমাকে কথা দিলাম, হিন্দু-ঠাকুরদের নাম আমি ওকে ভোলাবই ভোলাব।

জালিম। বহুত আচ্ছা! তোমার জবানের ওপর নির্ভর করে আজ আমি ফিরেই যাচ্ছি বিবিসাহেবা! লেকিন হুঁশিয়ার, একপক্ষকাল পরে আমি আবার আসবো। সেদিন যদি দেখি এই বেয়াদব এই-রকম কাফেরই আছে, তাহলে একে আমি কোতল করবো। হামেশা ইয়াদ রেখ বিবিসাহেবা, হামারা নাম হায় জালিম কাজী। [প্রস্থান।

আলেয়া। রমজান—রমজান! তুমি ওই হিন্দুর ঠাকুরদের নাম ভুলে যাও।

রমজান। এও কি সম্ভব ?

আলেয়া। উপায় নেই—উপায় নেই রমজান। এ দেশের রাজ-শক্তির দুরন্ত চাবুকের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে এ নাম তোমায় ভুলতেই হবে।

রমজান। না—না, তা আমি পারবো না আলেয়া। প্রাণ থাকতেও আমার ঠাকুরকে ভুলতে পারবো না।

আলেয়া। কেন পারবে না রমজান ? তুমিই তো বল আল্লাহতালা যে—ভগবানও সে।

রমজান। সবই সত্যি। কিন্তু আমি যে তাকে ভজনা করলে অন্তরের মধ্যে এক নতুন রূপ দেখতে পাই। [চক্ষু মুদিয়া] একি ! অন্তর মাঝে একি রূপ হেরি ! হরিবোল—হরিবোল—[প্রস্থানোদ্যত]

আলেয়া। রমজান !

রমজান। ওই—ওই ঠাকুর আমায় ডাকছে। দাঁড়াও—দাঁড়াও ঠাকুর, আমি যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

আলেয়া। কিন্তু কোথায় যাবে তুমি ?

রমজান। তা তো আমি বলতে পারবো না আলেয়া। তবে এটুকু বলতে পারি, ঠাকুর আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন, সেখানেই যাবো।

আলেয়া। না-না, তুমি এমনি করে আমায় ফেলে চলে যেও না।

রমজান। আলেয়া, তুমি আমার ঈশ্বরলাভে বাদ সাধবে ? তুমি আমায় তাঁর চরণ দর্শনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবে ?

আলেয়া। না গো না। বলছি এইজন্যে যে, বাপজানকে নবাব দরবারে বেঁধে নিয়ে গেছে, তুমিও বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাইছ। কিন্তু বল, আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছ ?

রমজান। আলেয়া!

আলেয়া। তোমার ঠাকুর কি এই কথা বলে যে, মানুষকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যেতে?

রমজান। বিপদ!

আলেয়া। বিপদ নয়? যদি কেউ একা পেয়ে—

রমজান। কার বিপদ কে ঘটাবে? আলেয়া! একমাত্র ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হলে বিপদ আসবে, আবার তাঁর ইচ্ছা হলে তিনিই রক্ষা করবেন। আমরা তো তাঁর খেলাঘরের পুতুল। তিনি যেমন নাচান, আমরা তেমনি নাচি।

সাহেব আলির প্রবেশ।

সাহেব। আলেয়া! আলেয়া! রমজান! রমজান!

রমজান ও আলেয়া। একি বাপজান!

আলেয়া। তুমি না সুলতানের বন্দী হয়ে—

সাহেব। সুলতান আমায় মুক্তি দিয়েছেন রে বেটি, সুলতান আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি খুব ভাল লোক, বুঝেছিস?

রমজান। তোমায় আমি বলিনি আলেয়া, যে সবই সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। এখন দেখ, তাঁরই ইচ্ছায় বাপজান রক্ষা পেয়ে ফিরে এসেছে।

আলেয়া। সত্যি বাপজান! আমি তো ভাবতেই পারিনি—

সাহেব। দাঁড়া বেটি দাঁড়া, আমি একটু আসি। [প্রস্থানোদ্যত]

রমজান। কোথায় যাচ্ছ বাপজান?

সাহেব। মোল্লা ডাকতে যাচ্ছি।

আলেয়া। কেন, মোল্লা কি হবে?

সাহেব। ও, তোদের বলিনি বুঝি? তবে শোন। জাঁহাপনা

বলেছেন—যাকে তুই ছোটবেলা থেকে পেয়ার করিস, তার সঙ্গে আজই তোর সাদি দিতে। বল তো বেটি, কাকে তুই খসম ভেবে পেয়ার করিস ?

আলেয়া। বাপজান—[মাথা নামাইল]

রমজান। মাথা নামিয়ে নিও না আলেয়া, এ যে স্বয়ং সুলতানের হুকুম।

সাহেব। বল না বেটি, বল।

রমজান। আমি বলবো ?

সাহেব। বল রমজান।

রমজান। আলেয়া ভালবাসে—কালমউদ্দিনকে, তাই না ?

আলেয়া। না।

সাহেব। তবে কি আনসারকে ?

আলেয়া। তাও না।

সাহেব। তবে কাকে পেয়ার করিস বলবি তো রে বাপু ! সুলতানের হুকুম কি ছেলেখেলার কথা ?

রমজান। বল না আলেয়া, তুমি খসম ভেবে এতদিন দীল দিয়ে কাকে পেয়ার করে আসছ ?

আলেয়া। সত্যি বলবো ?

রমজান। বলো।

আলেয়া। তোমাকে।

রমজান। [সাশ্চর্যে] আলেয়া !

আলেয়া। বিশ্বাস কর রমজান, ছেলেবেলায় তুমি যখন সাজতে আমার খেলাঘরের খসম, তখন থেকে আমার দীলের মাঝে আঁকা হয়ে গেছে তোমার তসবীর।

রমজান। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! এ তুমি ভুল করেছ। তুমি যে শূন্যে সৌধ নির্মাণ করেছ।

আলেয়া। না, ভুল আমি করিনি। ভুল করছো তুমি।

রমজান। ওরে, ভাইজান আর বহিনে কখনও সাদি হয় রে পাগলী?

সাহেব। হয় রমজান, হয়। ওরে—বিশ্বাস কর, এতদিন তোর কাছে কথাটা প্রকাশ করিনি; কিন্তু আল্লার কিরে খেয়ে আজ বলছি, আলেয়া তোর নিজের বহিন নয়।

রমজান। আমার নিজের বহিন নয়? তবে—তবে কি আমি—

সাহেব। তুই যে আমার কুড়িয়ে পাওয়া ব্যাটা।

রমজান। বাপজান!

সাহেব। অগত করিসনে ব্যাটা। আমি তোর হাতে ধরে বলছি, আলেয়াকে তুই দোয়া কর। আখেরে তোর ভাল হবে। খোদার ফজেল তোর মাথায় পড়বে।

রমজান। তুমি আমায় ক্ষমা কর বাপজান। জীবনে কখনও তোমার অবাধ্য হয়নি, আজ এই প্রথম অবাধ্য হলাম।

সাহেব। রমজান!

রমজান। নাই বা হলাম আমরা একই মায়ের সন্তান; তবুও জ্ঞান হবার পর থেকে জেনে এসেছি—আলেয়া আমার বহিন। তা ছাড়া আমার ঠাকুর চান না যে, আমি সংসারী হই। এবার আমায় বিদায় দাও।

সাহেব। তার মানে? কোথায় যাবি তুই?

রমজান। আর যে আমি অপেক্ষা করতে পার্রি না। এই মোহময় সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করে এবার যে আমায় তাঁর সন্ধানে যেতেই হবে।

সাহেব। কি বলছিস—কিছুই তো বুঝতে পারছি না। সাদি না করিস নাই বা করলি, তাই বলে সংসারে থাকতে কে মানা করেছে? যতসব পাগল কোথাকার!

রমজান। বাপজান!

সাহেব। তা হ্যাঁ রে, যাবিটা কোথায় শুনি?

রমজান। আমার শ্রীহরির সন্ধানে।

সাহেব। ফিরবি কবে?

রমজান। যদি তার মেহেরবানী হয়, আবার পরজন্মে তোমার ব্যাটা হয়েই ফিরে আসবো।

সাহেব। পরজন্ম মানে? তুই কি মনে করেছিস, একবার মরলে তার আবার জন্ম হবে?

রমজান। হবে। যার কাজ দুনিয়াতে বাকী থেকে যায়, তাকে পুনঃ পুনঃ নরদেহে জন্ম নিতেই হবে। এবার আমায় বিদায় দাও।

সাহেব। রমজান!

রমজান। যদি তোমার রমজানকে সত্যিই পেয়ার কর তাহলে আর চোখের পানি ফেলো না বাপজান!

আলেয়া। রমজান!

রমজান। বহিন!

আলেয়া। বহিন?

রমজান। হ্যাঁ, তুমি আমার ছোট্ট বহিন। আর আমি তোমার মেহের ভাইজান। তাইতো কারো বাধায় আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না।

সাহেব। ব্যাটা! তুই এই বুড়ো সাহেব আলির কলিজাটা ভেঙে চুরমার করে দিলি!

আলেয়া। বাপজানের কত আশা—সবই তুমি নিরাশায় ভরিয়ে দিলে। আমাদের এত সুন্দর সাজানো সংসার তুমি ভেঙে তছনছ করে দিলে! এই যদি তোমার মর্জি ছিল, তবে কেন তুমি নিজেকে এমনি-ভাবে আমার সামনে তুলে ধরেছিলে। কেন? কেন? [প্রস্থানোদ্যতা]

রমজান। আলেয়া! বহিন—

আলেয়া। না-না, এর উত্তর আমি যতদিন না পাই, ততদিন তুমি আমার নাম ধরে ডেকো না—নাম ধরে ডেকো না।

[বেগে প্রস্থান।

রমজান। ওঃ—ঠাকুর! একি করলে তুমি?

সাহেব। রমজান! যে ঠাকুর মানুষকে ঘরছাড়া করে, সে তো লক্ষ্মীছাড়া। তাকে ডেকে দরকার নেই। তুই বরং খোদাকেই ডাক।

রমজান। বাপজান! খোদা আর ভগবানে কোন ফারাক নেই। ফারাক শুধু জল আর পানিতে ফারাক যত।

[প্রস্থান।

সাহেব। ঠিক—ঠিক। কথাটা ফেলে দেবার নয়। কিন্তু—একি, ছেলেটা আবার গেল কোথায়? চোখের পলক পাল্টাতে না পাল্টাতে অমনি পালালো? যাকগে, আমার আর কি! একি, চোখে আবার পানি আসে ছাখ। দূর—দূর! সে হতভাগা আমার কে? তার জন্যে আবার কাঁদতে হবে নাকি? সে মরুক—আঃ—তোবা—তোবা! কি বলতে কি বলে ফেলেছি। খোদা! আমার কথা তুমি কানে নিও না। আমার কসুর তুমি মাফ কর মেহেরবান! রমজানকে তুমি রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য

সাহসপুরের গুলবাগ

অগ্রে হুকুম আলি, পশ্চাতে বিজলীবাঈয়ের প্রবেশ।

হুকুম। এসো—এসো বাঈসাহেবা ছম্-ছমাছম্—ছম-ছমাছম্ করে চলে এসো।

বিজলী। এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে হুকুম আলি?

হুকুম। আরে এত ঘাবড়াচ্ছো কেন? এটাই তো কাজী সাহেবের গুলবাগ।

বিজলী। কাজী সাহেবের গুলবাগ?

হুকুম। দেখতে পাচ্ছ না, চারদিকে ফুটে রয়েছে রং-বেরংয়ের গুল। এরই মাঝখানে তুমি ফুটে থাকবে বসরাই গোলাপ হয়ে। তোমার খসবুতে কত পুরুষ মাতাল হবে। তুমি তোমার রূপের জৌলুসে যৌবনের ঢেউ দিতে দিতে তাদের বেহুঁশ করে ছেড়ে দেবে।

বিজলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোমার বুদ্ধি আছে বলতে হয়।

হুকুম। তুমি যে আমায় চিনতে পেরেছ, তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।

জালিমের প্রবেশ।

জালিম। হুকুম আলি আছিস, হুকুম আলি? এই যে হুকুম আলি। শুনলাম লাখনৌ থেকে এক খ্যাতনামা রূপসী বাঈজীকে তুই নাকি এখানে আমদানী করেছিস?

হুকুম। তা করেছি। তাই শুনেই বুঝি—

জালিম। হ্যা। কি যেন নাম তার?

বিজলী। বিজলীবাঈ।

জালিম। বহুতাচ্ছা! হুকুম আলি! বাঈসাহেবার সঙ্গে আমার কথা আছে, তুই বাইরে অপেক্ষা কর।

হুকুম। যো হুকুম। [প্রস্থান।

জালিম। তোমারই নাম বিজলীবাঈ?

বিজলী। জী হাঁ।

জালিম। সুদূর লাখনৌ থেকে হুকুম আলি তোমাকে—

বিজলী। এই সাহসপুর গুলবাগে আমদানী করেছে।

জালিম। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, এই সাহসপুরের থানাদার মেহেরবানী করে তোমার সঙ্গে—

বিজলী। ফূর্তি করতে এসেছেন। কিন্তু কোন উপায় নেই থানাদার সাহেব!

জালিম। কারণ?

বিজলী। কারণ আমি জানি, দেওয়ান ভাবনা কাজী সাহেবই আমাকে এখানে আমদানী করেছেন।

জালিম। তাতে কি হয়েছে? ভাইসাহেব আনিয়েছে, পহেলে আমিই ফূর্তি করবো।

বিজলী। থানাদার!

জালিম। হঃ-হাঃ-হাঃ! তাজ্জব হয়ে যেও না বাঈসাহেবা। এই তো দুনিয়ার হাল। দাদার জিনিসে থাকে ছোট ভাইয়ের সম্পূর্ণ অধিকার। এ যদি সত্যি হয়, তাহলে তোমাকে নিয়ে ফূর্তি করতে আমার বাধা কোথায়? নাচ—গাও, ফূর্তির ফোয়ারায় বান ডাকিয়ে দাও।

বিজলী। [আপন মনে] থানাদার জালিম কাজী এত সুন্দর—এত সুপুরুষ! আমার জীবনে বহু পুরুষ এসেছে, কিন্তু—

জালিম। কি ভাবছ বাঈসাহেবা?

বিজলী। না, কিছু না। বলছিলাম, আমার একটা নাচ-গানের মূল্য—

জালিম। লাখো আসরফি। কই পরোয়া নেই। ম্যায় তুমকো দো লাখ আসরফি দেনে সাকতা। নাচ—গাও, তোমার ওই কচি ঠোঁটের মিষ্টি হাসিতে, আঁখের রোশনীতে, রূপের ঝলকে আমায় মশগুল করে তোল।

বিজলী। থানাদার সাহেব!

জালিম। আমি হারিয়ে যেতে চাই—আমি ভেসে যেতে চাই, ডুবে যেতে চাই—তলিয়ে যেতে চাই। দেখতে চাই—পাপ কত পঙ্কিল, নরক কত ঘৃণ্য, জীবন-যন্ত্রণা কত অসহ্য। এই নাও। [নিজের কণ্ঠহার বিজলীকে দিল]

বিজলী। একি, আগেই দিলেন!

জালিম। খুশি করতে পারলে পরেও দেবো।

বিজলী। না-না, আপনাকে কিছুই দিতে হবে না।

জালিম। কেন?

বিজলী। [নৃত্যসহ]

গীত

শুনিতে চেয়ো না সখা, মনের নাগাল পাও যদি।
আঙুর রসে ভিজিয়ে দেবো, দীল খেলোয়াড় হও যদি॥
নয়না বানের এমনি দাগা,
সোনার সাথে ঠিক সোহাগা,
(দেখি) ওষ্ঠ দুটি তুষ্ট করে, মনের বিকার যায় যদি।

আঙুর রসের লাল সিরাজী,
দীল দরিয়ার এই তো মাঝি,
প্রেম তুফানে ভাসিয়ে দেবো ভাঁটার আগে নাও যদি ॥

জালিম। বহুতাচ্ছা—বহুতাচ্ছা মেরী পিয়ারী! বহুৎ মজাদার হ্যায় তোমহারি গানা, বহুৎ বড়িয়া হ্যায় তোমহারি নাচ। ম্যায় তুমকো সাদি করেগা বিবিসাহেবা। [ধীরে ধীরে কাছে যাইয়া ধরিল]

বিজলী। থানাদার সাহেব!

জালিম। বল, কথা দাও—কথা দাও মেরে পেয়ারীজান বিজলী! তুমি আমাকে সাদি করবে?

নেপথ্যে ভাবনা। হুকুম আলি—হুকুম আলি—

জালিম। বল বাঈসাহেবা! তুমি আমাকে সাদি করবে?

বিজলী। থানাদার সাহেব!

জালিম। আসরফি চাই? কত আসরফি? আমি তোমাকে আসরফির ওজনে কিনে নেবো। সোনা, রূপা-মণি-মুক্তো, হীরা-জহরৎ দিয়ে আমি তোমায় মুড়ে দেবো। বল বিজলীবাঈ, অমত করবে না তো? আমায় সাদি করবে?

বিজলী। কেন করবো না। কিন্তু আমি তো একজন সামান্যা দেহপশারিণী ঘৃণ্যা কসবী। আমাকে কি আপনি সত্যিই সাদি করে সমাজের বুকে ঠাঁই দেবেন?

জালিম। সমাজ জাহান্নামে যাক। তুমি ঠাঁই পাবে তোমার মহব্বতের দীলদার এই থানাদার জালিম কাজীর বুকে। [জড়াইয়া ধরিল]

অগ্রে ভাবনা কাজী, পশ্চাতে হুকুম আলির প্রবেশ।

ভাবনা। আলিম!

আলিম। কে? মহামান্য ভাইসাহেব? আপনি হঠাৎ অসময়ে এখানে?

ভাবনা। আমিও তোমায় ঠিক ওই কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তুমি হঠাৎ এখানে কেন?

আলিম। শুনলাম লাখনৌ থেকে বিজলীবাঈ এসেছে তামাম বাংলার জোয়ানদের সঙ্গে খুশির মহড়া দিতে। তাইতো আমি একটু যাচাই করে দেখলাম, খুশি করনেওয়ালি কতখানি সাচ্চা।

ভাবনা। চোপরাও বেয়াদব! যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে

আলিম। যাচ্ছি। একে আপনি বাংলার সুলতানের পেয়ারের দেওয়ান, তায় আবার আমার বড় ভাইজান বলে কথা। আপনি যখন হুকুম করেছেন, নিশ্চয়ই বেরিয়ে যাবো। আর না গেলে লোকেই বা ভাববে কি?

ভাবনা। তবে যাও না মূর্খ। বুদ্ধিহীনের মত এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন?

আলিম। ভাবছি, কাজটা খুব ভুল করলাম নাকি? আচ্ছা বলতে পারেন—আমি তো মূর্খ—বুদ্ধিহীন; কিন্তু যেখানে বুদ্ধিহীন ছোট ভাইজান সিরাজী আর বাঈজী নিয়ে মশগুল থাকে, সেখানে কোন হিসাবে তার বুদ্ধিমান বড় ভাইসাহেব জেনেশুনেও প্রবেশ করে।

ভাবনা। চোপরাও মাতাল!

আলিম। আমি মাতাল একথা সত্যি ভাইসাহেব! কিন্তু আপনার

মত্ত বেতাল নই। কারণ আমি সরাপ পান করি, কিন্তু সরাপ কোনদিন আমায় পান করেনি।

[প্রস্থান।

ভাবনা। জালিম কাজী! শয়তান—নিমকহারাম!

হুকুম। আহা-হা-হা! অত লাফাবেন না হুজুর! তাহলে হয়তো বাঈসাহেবা আপনাকে বেহিসাবী ভাববে।

ভাবনা। তুই এখানে কেন?

হুকুম। সেকি হুজুর? আমিই তো বহুৎ তকলিফ করে বাঈ-সাহেবাকে এখানে আনলাম। আর—

ভাবনা। বেশ করেছিস। যা, বাইরে যা।

হুকুম। যো হুকুম। [প্রস্থানোদ্যত]

ভাবনা। আর শোন—

হুকুম। হুকুম করুন হুজুর!

ভাবনা। সব সময় দরোয়াজায় খাড়া থাকিস। দেখিস, কেউ যেন এখানে প্রবেশ করতে না পারে।

হুকুম। আপনি কিছুই চিন্তা করবেন না। আমি বাইরে থেকে দরোয়াজা বন্ধ করে দিচ্ছি হুজুর। একটা পিঁপড়েও ঢুকতে পারবে না।

[প্রস্থান।

ভাবনা। বাঈজী বিজলীবাঈ—

বিজলী। আদেশ করুন।

ভাবনা। শুনেছি তোমার একটা নাচ-গানের মূল্য নাকি লাখ আসরফি?

বিজলী। আপনার অনুমান সত্যি।

ভাবনা। বেশ, তাহলে দেখাও তোমার নাচ, শোনাও তোমার গান।

বিজলী। মেহেরবানী করে কুরশিতে বসুন। [ভাবনা বসিল]

গীত

সূর্যের আলপনা—রাতের জ্যোছনা, এই নিয়ে চলে খেলা।
জানি মেহেরবান, সব তোমার দান কেন এ হরেক মেলা ॥
কত যে কুসুমে মালা গেঁথে হায়,
এ দীনার দিন বয়ে চলে যায়,
চোখ মেলে চাও রাখ মিনতি দিও নাকো প্রাণে জ্বালা ॥

ভাবনা। বহুতাচ্ছা বিজলীবাঈ। খাসা নাচ, তোফা গান। আচ্ছা বাঈজী! আমি তোমায় যা হুকুম করবো, তুমি তাই পালন করবে?

বিজলী। হুকুম করেই দেখুন।

ভাবনা। আমার হাতে কি দেখছ?

বিজলী। ও তো সরাপ।

ভাবনা। আর এ হাতে? [ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইল]

বিজলী। ও তো শানিত ছুরিকা।

ভাবনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হ্যাঁ, ছুরিকা। তাহলে শোন। আমার হুকুম, আজ নিশীথ রাত্রে আমি তোমাকে সুলতান হোসেন শাহের শয়নকক্ষ দেখিয়ে দেবো।

বিজলী। তাহলে কি ওই ছুরি দিয়ে আমি—

ভাবনা। হ্যাঁ; কিন্তু মনে রেখো, সুলতান খুব চতুর আর বুদ্ধিমান। সে হয়তো তোমায় নানা প্রশ্ন করবে। কিন্তু তুমি তার সঙ্গে মহব্বতের

অভিনয় করে সরাপ পান করিয়ে, নাচ দেখিয়ে, গান শুনিয়ে তোমার অলীক আসনাইয়ে তাকে বেহুঁশ করে দেবে। তারপর—

বিজলী। তারপর?

ভাবনা। এই শানিত ছুরিকা তার কলিজায় আমূল বিদ্ধ করবে।

বিজলী। জনাব!

ভাবনা। চুপ! দেওয়ালেরও কান আছে। তারা হয়তো দেওয়ান ভাবনা কাজীর কলঙ্ক ঘোষণা করবে। বল··পারবে? অবশ্য বিনিময়ে পাঁচ লাখ আসরফি বকশিস পাবে।

বিজলী। [ইতস্তত করিয়া] না-না জনাব! এ আমি কোনদিনই পারবো না।

ভাবনা। এ তোমাকে পারতেই হবে বিজলীবাঈ।

বিজলী। জনাব! আমি বাজারের কসবী হতে পারি, তবুও আমার একটা ধর্ম আছে।

ভাবনা। ধর্ম? হাঃ-হাঃ-হাঃ! কসবীর আবার ধর্ম!

বিজলী। কসবী হলেও আমি গুপ্তঘাতক নই জনাব।

ভাবনা। উপদেশ দিতে এসো না বাঈজী! বল, আমার হুকুম তামিল করবে কি না?

বিজলী। না।

ভাবনা। পারবে না?

বিজলী। না—না, কিছুতেই পারবো না। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

ভাবনা। ক্ষমা? হাঃ-হাঃ-হাঃ! ক্ষমা? তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না সুন্দরী। আমার মনের গোপন ইচ্ছা যখন একবার

তোমার কাছে প্রকাশ করেছি, তখন হয় তুমি সে কাজ করবে, আর তা না হলে—

বিজলী। কি করবেন জনাব?

ভাবনা। যাতে তোমার মুখ থেকে সেকথা অন্য কারো কাছে প্রকাশ না পায়, শুধু সেই কারণে তোমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। [ছুরি মারিতে উদ্যত]

বিজলী। [সরিয়া গিয়া] জনাব! না-না, অমন কাজ করবেন না। পারবো—পারবো জনাব, এ আমি নিশ্চয়ই পারবো। [মদ্যপাত্র ও ছুরিকা গ্রহণ]

ভাবনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি জানি বিজলীবাঈ, সোজা আঙুলে কোনদিন ঘি ওঠে না। এসো আমার সঙ্গে। কাজ হাসিল হলে আমি যদি বাংলার সুলতানি পাই, তুমি হবে আমার প্রধানা বেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

বিজলী। বেগম! আমিই হবো বাংলার প্রধানা বেগম! আর এতদিন যারা বেগমের মর্যাদা নিয়ে মহলে আছে, তারা হয়তো হবে আমারই দাসী-বাঁদী। ওঃ—কি জোর নসীব আমার! আমরা বাজারের দেহপশারিণী বলে—ঘৃণিতা বাঈজী বলে কেউ আমাদের মানুষের অধিকার দেয় না। সমাজের সবাই জানে, রূপিয়ার বদলে আমরা রূপ বিক্রি করি। তাই সেখানে উচ্চ-নীচের প্রভেদ নেই, পিতা-পুত্রের তফাত নেই, বাজারের পণ্যদ্রব্যে সকলেরই সমান অধিকার। চমৎকার—বিধাতা, চমৎকার তোমার রং মাখানো রঙিন দুনিয়া।

[প্রস্থান।

গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। কে—কে? তবে কি—না-না, সে তো অনেকদিন আগেই পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে বিদায় নিয়েছে। এইতো—এইতো তার হাতের লেখা সেই চিঠি। আজও আমি এটা যত্ন করে রেখে দিয়েছি। গীতা আমায় বিয়ে করতে লিখেছে, সে আমায় ভুলে যেতে লিখেছে। এই পাপ কলিযুগে আমার ধর্মগ্রন্থ গীতাকে ওরা কোরান শরীফ তৈরী করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ইসলাম সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। গীত-গোবিন্দের কাছে আজ গীতা নেই, সে কেবল শুধু গোবিন্দ দাস, শুধুই গোবিন্দ দাস।

হুকুম আলির প্রবেশ।

হুকুম। এই গোবিন্দ দাস, তুমি এখানে কেন?

গোবিন্দ। কে? হুকুম আলি ভাই! আচ্ছা বলতে পারো—কে ওই মেয়েটা?

হুকুম। কেন?

গোবিন্দ। ওকে আমার গীতার মত দেখতে কিনা তাই দেখছিলুম। কিন্তু ঠিক আমার স্ত্রীর মত দেখতে ওকে। ওর বাড়ি কোথায়?

হুকুম। লাখনৌ। ওর নাম বিজলীবাঈ। লাখনৌ বাঈজীপল্লীর খ্যাতনামা গায়িকা।

গোবিন্দ। কি নাম বললে! বিজলীবাঈ। গীতাকেও দেখতে বিজলীর মত ছিল। সেও তো আমায় সুন্দর গান গাইতে পারতো।

হুকুম। কিন্তু কোথায় গেল তোমার স্ত্রী?

গোবিন্দ।—

গীত

হারায়ে গিয়াছে নয়নের নিধি নিকষ আঁধারে।
চুরি করে চোরা ডুব দিয়েছে ওগো ইসলাম সাগরে॥
কত যে ডাকিনু গীতা গীতা বলে হিসাব নাইকো তার,
সাড়া নাহি পেনু এ জীবনে কভু দিয়াছে পত্র উপহার,
বিদায় নিয়েছে সংসারী হতে উপদেশ দিয়ে আমারে॥

হুকুম। গোবিন্দ দাস—

গোবিন্দ। দিল্লীর বাদশা বহলুল লোদীর তহশীলদারী করতাম বিনা, তাইতো আজ পথে পথে ভিক্ষে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভাই।

হুকুম। কেন? যে গেছে, তাকে ভুলে যাও। আবার তুমি বিয়ে-সাদি কর—সংসারী হও।

গোবিন্দ। একটা ফুলে তুটো দেবতার পূজো হয় না হুকুম আলি! যদি তাকে কোনদিন পাই, আবার আমি তাকে নিয়েই সংসারী হব হুকুম ভাই, তবু অন্য কাউকে বিয়ে করে আমি আমার গীতার সঙ্গে বেইমানি করতে পারব না।

[প্রস্থান।

হুকুম। খোদা! এরাও তোমার বিচারে আজ পথে পথে ঘুরছে। আজব তুমি, আর তাজ্জব তোমার বিচার।

[প্রস্থান।

— — —

পঞ্চম দৃশ্য

নদীপথ

রামু ঠাকুরের প্রবেশ। সারামুখে দাড়ি-গোঁফ, গায়ে নামাবলী, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি।

রামু। না-না, পূজো-পার্বণ করে আর সংসার চলবে না। রাজবাড়িতে যারা চাকরি করে, মন্ত্র-তন্ত্র না জানলেও তারাই নাকি ব্রাহ্মণ। আর আমরা ঘোড়ার ঘাস কাটতে জন্মেছি। দু'বেলা পেটের ভাত যদি জোগাড় করতে না পারি—কি দরকার আছে বেঁচে থেকে! দূর—দূর, এ জীবন আর রাখব না। কিন্তু নিয়তি—না-না, চিন্তা কিসের! যে যার ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। আমি বেঁচে থাকলেও যা হবে, আর না থাকলেও তাই। তবে একমাত্র মা-বাপহারা ছোট্ট বোন—অন্তত তাকে যদি পাত্রস্থা করে যেতে পারতুম, আর কোন চিন্তাই থাকতো না। যাক, এবার ভগবানের নাম নিয়ে এই কালিগঙ্গার জলে—

নেপথ্যে রমজান। দেখা দাও—দেখা দাও শ্রীমধুসূদন!

রামু। কে—কে?

নেপথ্যে রমজান। কই ঠাকুর, কোথা তুমি? দেখা দাও।

রামু। কে যেন এদিকে আসছে না? ঠিক আছে। সহজ ভাবে যখন এই পৃথিবীতে বাঁচা যাবে না, তখন জোর করেই বাঁচবো। দরকার হলে দশজনকে খুন করেই বাঁচবো। এই আনন্দময় পৃথিবীতে সকলের সঙ্গে সমানভাবে বাঁচার অধিকার আমার আছে। পাপ?

কিসের পাপ? সংসারের কর্তা হয়ে স্বজনদের মুখে দুটো ভাত তুলে দিতে পারিনি, তাতে কি পাপ হচ্ছে না? ধর্ম? কিসের ধর্ম? ওসব মিথ্যার আবরণ মাত্র। যাক, ওই ঝোপটার আড়ালে একটু গা ঢাকা দিই।

[প্রস্থান।

সাশ্রুনেত্রে রমজানের প্রবেশ।

রমজান। কই—কই, কোথা গেলে তুমি? কোথায় লুকালে তুমি হৃদয়হরণ, বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন? দেখা দাও—ওগো প্রাণের ঠাকুর, দেখা দাও।

লাঠি হাতে রামুর পুনঃ প্রবেশ।

রামু। এই—কে তুই?

রমজান। তুমি—তুমি কে? তুমি কি আমার সেই প্রাণের ঠাকুর?

রামু। চুপ! ঠাকুর নই, আমি ডাকাত।

রমজান। এভাবে কেন ছলনা করছ দয়াময়? কোথায় গেল তোমার সেই সৌম্যশান্ত মূর্তি—

রামু। এ্যাই—তুই তোর ঠাকুরকে দেখেছিস? ভণ্ড কোথাকার!

রমজান। আগে চাক্ষুষ দেখিনি বটে, তবে এখন তো আমার সামনে দেখছি।

রামু। কোথায়?

রমজান। তুমিই তো আমার ঠাকুর।

রামু। না-না, মিথ্যা কথা। আমি ঠাকুর নই, ডাকাত।

রমজান। ডাকাত?

রামু। হ্যাঁ, ডাকাত।

রমজান। ডাকাত হলেও তুমি তো তাঁরই সৃষ্টি। তিনি তো সর্বজীবেই বর্তমান

রামু। সর্বজীবেই বর্তমান? তাহলে আমার দেহের মধ্যেও—

রমজান। আছে। ঠাকুর তোমার দেহে লুকিয়ে আছেন।

রামু। তাই নাকি? তবে—[হাতের লাঠি পড়িয়া গেল]

রমজান। হ্যাঁ গো! তা না হলে তোমার সঙ্গে আমার এখানে দেখা হবে কেন? এই পথে কি কোন মানুষ আসে! তবু কেন আসতে হয়েছে জান? সবই তাঁর ইচ্ছা।

রামু। কি বলছ তুমি?

রমজান। ঠিকই বলছি। বিশ্বপিতা—বিশ্বপতি—বিশ্ববিচারক যার নাম, তাঁর ইঙ্গিতের বাইরে যাবে—সে সাধ্য তোমার কোথায়?

রামু। তুমি তোমার ঠাকুরকে আমায় দেখাতে পারবে?

রমজান। নিজের ওপর বিশ্বাস থাকলে শুধু তুমি কেন, সবাই তাঁকে দেখতে পাবে।

রামু। বিশ্বাস? হ্যাঁ, বিশ্বাস আমার আছে। তা না হলে যে সঙ্কল্প নিয়ে কিছুক্ষণ আগে এই নদীকূলে এসেছিলাম, পরপর মতের পরিবর্তন হবে কেন? আমি তো অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করতেই চেয়েছিলাম।

রমজান। দূর, পাগল কোথাকার! লক্ষ লক্ষ তপস্যার ফলে মানবের রূপ পেয়েছো। এইতো শ্রেষ্ঠ জন্ম। অবহেলা করে তা নষ্ট করে দেবে কেন? দেখ, অপেক্ষা কর। কেন ঠাকুর তোমাকে অভাব দিয়েছেন বুঝে দেখ।

রামু। ঠাকুর অভাব দিয়েছে ?

রমজান। তুমি তো আর অভাব নিয়েই পৃথিবীতে জন্মাওনি! তাছাড়া নিজের ইচ্ছায়ও ধনী হতে পারবে না। সবই ঠাকুরের দেওয়া দান।

রামু। সত্যিই তাই। কিন্তু ঠাকুর আমাকে এত অভাব দিয়েছেন কেন ?

রমজান। অভাবে না পড়লে মানুষ যে তাকে ঠিকমত ডাকবার সুযোগ পায় না। পেটের জ্বালা যে মস্ত জ্বালা! সে জ্বালায় যখন মানুষ জ্বলে, তখনই তাঁকে ঘন ঘন ডাকে।

রামু। তাহলে আমি তাঁকে না ডেকে কেন এত পাপ করছি ?

রমজান। পাপ ?

রামু। হ্যাঁ। গরীব বামুনের ছেলে হয়ে আমি ডাকাত সাজতে চেয়েছিলাম। তোমার মাথায় লাঠি মারতে এসেছিলাম। এতবড় মহাপাপী—

রমজান। মহাপাপীও মুক্তি পায়।

রামু। কি উপায়ে ?

রমজান। সদাই একমনে তার নাম ভজনা কর। ঠাকুর তো আমার গীতায় বলেছেন—পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ [চক্ষু মুদিল] এ'ক! কে তুমি ? নবদূর্বাদল শ্যাম ভুবনমোহন ? [চাহিয়া] কই—কই! কোথা গেলে তুমি ? [প্রস্থানোদ্যত]

রামু। কোথায় চললে ?

রমজান। ঠাকুরের সন্ধানে। পথে পথে দিনরাত ঘুরে বেড়াবো। যদি—

রামু। না-না, তোমায় আর আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াতে দেবো না। এসো আমার সঙ্গে।

রমজান। তোমার সঙ্গে? কোথায়?

রামু। আমার পাড়ার সেই ছোট্ট কুঁড়েঘরে। তোমাকে আমার সিংহাসনে বসিয়ে—

রমজান। কি বলছ তুমি? আমি—

রামু। তুমিই তো আমার ঠাকুর।

রমজান। না ভাই! তুমি ফিরে যাও। ঠাকুরকে ডাকলেই তাঁর দেখা পাবে।

রামু। তাই কি হয়! সাধু-সজ্জনের দেখা একবার যখন পেয়েছি, আর তো তোমাকে ছেড়ে দেবো না ঠাকুর! আমি তোমাকে মাথায় করে নিয়ে যাব। এস—[হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত]

রমজান। ঠাকুর! এও তোমার এক লীলা। কত খেলা তুমি খেলবে জগত্তারণ? আমি তো খেলাঘরের পুতুল মাত্র।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হোসেন শাহের শয়নকক্ষ

ধীর পদক্ষেপে হোসেনের প্রবেশ।

হোসেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। আঁধার সুন্দরী রাত্রির শীতল কোলে। তামাম দুনিয়া ঘুমঘোরে অচেতন। ঘুম নেই কেবল বাংলার হতভাগ্য সুলতানের চোখে। [আসন গ্রহণ করিল] আঃ—খোদা!

মদ্যপাত্র হস্তে বিজলীর প্রবেশ।

বিজলী। জাঁহাপনা!

হোসেন কে?

বিজলী। আমি এক বাঈজী হজরৎ।

হোসেন। বাঈজী! সহসা নিশীথ রাত্রে বাঈজীমহল পরিত্যাগ করে এখানে কেন?

বিজলী। আমি তো আপনার বাঈজীমহলে থাকি না।

হোসেন। তাহলে কোথায় থাক?

বিজলী। সুদূর লাখনৌতে।

হোসেন। লাখনৌ? এশিয়ার সবশ্রেষ্ঠ রূপসী বাঈজীপল্লী লাখনৌ! কি নাম তোমার?

বিজলী। বিজলীবাঈ।

হোসেন। বাঃ, চমৎকার নাম তোমার! যাক, এখন বল বিজলী-বাঈ! সুদূর লাখনৌ পরিত্যাগ করে এখানে হঠাৎ কি প্রয়োজন?

বিজলী। বলতে সরম হয় জনাব।

হোসেন। সরমের কোন কারণ নেই। এই গুপ্ত শয়নকক্ষে কেবল-মাত্র তুমি আর আমি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। তুমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পার।

বিজলী। গোস্তাকি মাফ করবেন। আমি আপনাকে অনেকদিন থেকেই মনে মনে মহব্বত করি। আজ আবার সামনা-সামনি দেখে নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলেছি কোন মৌজের দরিয়ায়।

হোসেন। আমি অত্যন্ত ধন্য বাঈসাহেবা, যে কেবলমাত্র এক লহমা আমা   খেই তুমি আমার মহব্বতের তুফানে হাবুডুবু খেতে শুরু করেছ।

বিজলী। জাঁহাপনা কি সরাপ পান করেন?

হোসেন। আলবৎ। এনেছ নাকি? [জনান্তিকে] বুদ্ধিহীনা নারী!

বিজলী। জী! [মদ দিল] এর সঙ্গে মিঠি গান, মৌজি নাচ—জাঁহাপনার কি আপত্তি আছে?

হোসেন। আপত্তি? হাঃ-হাঃ-হাঃ! দেখ বাঈজী, নিশীথ রাত্রির নির্জন গুপ্ত শয়নকক্ষে যদি কোন রূপসী নারী স্বেচ্ছায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, আমার মনে হয় তামাম দুনিয়ায় এমন কোন নির্বোধ নেই, যে তার রূপ-লাবণ্যকে অবহেলায় দূরে সরিয়ে দেয়। তুমি নাচ—গাও।

বিজলী।— গীত

নিশিরাত বাঁকা চাঁদ আকাশে,
কিসের সুরভি যেন বাতাসে বাতাসে।

কত যে তারার দল করে ঝিলমিল,
মনের ময়ূরী কেন হাসে খিলখিল—
আমি প্রহর গুনি শুধু তোমারই আশে ॥
প্রেমের জোয়ারে দেবো পেয়ালা ভরে,
পেয়ার তুফানে যেন যাই গো হেরে,
কত আশা কত নেশা—এলো ফাগুন মাসে ॥

হোসেন। বহুত আচ্ছা—খাশা !

[বিজলী পুনরায় মদ দিল। হোসেন কৃত্রিম নেশাগ্রস্ত হইয়া চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল।]

বিজলী। এই সেই বাংলার নবাব আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। আমার কৃত্রিম নৃত্য-গীত উপভোগ করতে করতে উগ্র মদের নেশায় হয়েছে বেহুঁশ। কিন্তু এত সুন্দর যার চেহারা, এত যার বীরত্ব, যে এত সুবিচারক, যার সুশাসনে বাংলার মিলিত হিন্দু-মুসলমান আজ ধন্য, সেই দিগ্বিজয়ী বীরকেও গুপ্তহত্যা করার লোক থাকে ! ভগবান, আমি নিরুপায়। আমার অবস্থা বুঝে তুমি ক্ষমা কর ঠাকুর, ক্ষমা কর। না-না, আর দেরী নয়, এই উপযুক্ত অবসর। এই অবসরে সুলতানের বক্ষে এই ছুরিকা আমূল বসিয়ে দিতেই হবে। [হোসেনকে ছুরি মারিতে উদ্যত হইল]

নেপথ্যে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—[পুনঃ পুনঃ অট্টহাসি]

বিজলী। [ভয় পাইয়া চমকাইয়া] একি ! কে এমন বীভৎস অট্টহাসি হাসছে ? নাঃ, আর দেরী নয়। কারও উপস্থিতির পূর্বেই আমায় কাজ হাসিল করতে হবেই। [পুনরায় ছুরি মারিতে উদ্যত]

হোসেন। [সহসা বিজলীর হাত ধরিয়া ফেলিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ! বহুতাচ্ছা বিজলীবাঈ! বড়ি মজাদার হ্যায় তোমহারি মহব্বত।

বিজলী। [ছুরি ফেলিয়া দিয়া অনুনয়ের সুরে] জাঁহাপনা! আমি অপরাধী, আমাকে আপনি শাস্তি দিন।

হোসেন। শাস্তি?

বিজলী। হ্যাঁ, কঠোর শাস্তি দিন জনাব। যেন আমার অপরাধের কথা চিন্তা করে ভবিষ্যতে কেউ কোনদিন এতখানি অপরাধ করতে সাহসী না হয়।

হোসেন। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] হুঁ!

বিজলী। আমাকে বন্দী করে কঠিন কারায় নিক্ষেপ করুন। কাল প্রকাশ্য দরবারে আমার বিচার করবেন।

হোসেন। না, প্রকাশ্য দরবারে তোমার বিচার হবে না।

বিজলী। জাঁহাপনা!

হোসেন। কারণ, তুমি অপরাধ করেছ এই শয়নকক্ষে। তোমার বিচার আমি এখানেই শেষ করতে চাই।

বিজলী। জাঁহাপনা!

হোসেন। তুলে নাও ওই ছুরিকা। তোল—তোল। [বিজলী ছুরি লইল] এগিয়ে এসো, বসিয়ে দাও এই হতভাগ্য সুলতানের বক্ষে। কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে না—কেন সুলতান হোসেন শাহ আত্মহত্যা করেছে?

বিজলী। জনাব, এ আপনি কি বলছেন? আমাকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিন।

হোসেন। দেবো। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। এই নিশীথ রাত্রে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমি

কি তোমার কাছে কোন অন্যায় করেছি? আমি কি তোমার কাছে কোন অপরাধ করেছি? আমি তোমার নারীত্বের এতটুকু অবমাননা করেছি বহিন?

বিজলী। বহিন! জাঁহাপনা! সবাই আমাকে কসবী বলে ঘৃণা করে, আর আপনি আমাকে—

হোসেন। বহিন বললাম। কারণ আমি শুধু একটা কথাই জানি—তামাম দুনিয়ায় আমার বেগম ছাড়া আর যত নারী আছে, তারা আমার মা আর বহিন।

বিজলী। ভাইজান!

হোসেন। ভাইজান? হাঃ-হাঃ-হাঃ! তাহলে তুমিও স্বীকার করছো যে, আমি তোমার ভাইজান আর তুমি আমার বহিন?

বিজলী। সত্যি ভাইজান! আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আজ থেকে আপনি আমার ভাইজান আর আমি আপনার স্নেহের বহিন।

হোসেন। বাঃ—চমৎকার! এইবার বল তো বহিন, আমাকে খুন করার জন্যে কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছিল?

বিজলী। আমায় মাফ করুন ভাইজান, আমি তার নাম বলতে পারবো না। তাহলে সে শয়তান আমায় আর বাঁচিয়ে রাখবে না।

হোসেন। তামাম দুনিয়ায় কোন শয়তানের হিম্মত হবে না, বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের বহিনের গায়ে কাঁটার আঁচড় বসাতে পারে। বল—বল বহিন, কে সেই শয়তান?

বিজলী। আপনারই বিশ্বস্ত দেওয়ান ভাবনা কাজী।

হোসেন। [চমকাইয়া] ভাবনা কাজী! চমৎকার নসীব আমার।

কিন্তু তুমি যে আজ আমায় খুন করতে চেয়েছিলে, বিনিময়ে সে তোমায় কি দিতে চেয়েছিল?

বিজলী। পাঁচ লাখ আসরফি। আর কথা দিয়েছিল—সে যদি বাংলার সুলতান হতে পারে, আমি হবো তার প্রধানা বেগম।

হোসেন। বেগম? কিন্তু আমি তো তোমায় একটাও আসরফি দিতে পারবো না বহিন। নামেই আমি শুধু বাংলার সুলতান; কিন্তু তোমার ভাইজান বড় গরীব—বড় অসহায়। কি আছে আমার? কি দেবো তোমায়?

বিজলী। সারা পৃথিবীতে কেউ আমায় যা দেয়নি, তাই পেয়েছি আপনার কাছে। এর চেয়ে বড় বখশিস আর কি আছে?

হোসেন। বহিন—

বিজলী। হ্যাঁ ভাইজান, আজ থেকে আমি বাংলার দণ্ডমুণ্ডের মালিক সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের বহিন।

হোসেন। বহিন!

বিজলী। এখন আসি ভাইজান।

হোসেন। তাই কি হয়! তবে তোমার ভাবী যদি তোমাকে ছেড়ে দেয়, তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পার।

বিজলী। আর যদি ছেড়ে না দেয়?

হোসেন। তাহলে চিরদিন তোমাকে স্নেহের শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে থাকতে হবে এই নবাব প্রাসাদে।

বিজলী। কিন্তু লাখনৌ—

হোসেন। লাখনৌতে বোধহয় তোমায় আর ফিরে যাওয়া হবে না বহিন। শাহজাদীর মর্যাদা নিয়ে চিরকাল তোমাকে থাকতে হবে এই বাংলার প্রাসাদে। এসো আমার সঙ্গে।　　　　[প্রস্থান।

বিজলী। জীবনের একি পরিবর্তন হলো আমার? শয়তান ভাবনা কাজী! তুমি যতই চেষ্টা কর, সুলতানকে মারার শক্তি তোমার হবে না। কথায় বলে রাখে হরি মারে কে? তাই সুদূর লাখনৌ থেকে যাকে এনেছিলে সুলতানকে গুপ্তহত্যা করাতে, অদৃষ্টের পরিহাসে লাখনৌ বাঈজীপল্লীর সেই অস্পৃশ্যা বাঈজী আজ সুলতান হোসেন শাহের স্নেহের বহিন। চমৎকার বিধাতা, চমৎকার বিচার তোমার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভদ্রকালীর মন্দির সম্মুখস্থ বিশ্রাম ভবন

নিয়তির হাত ধরিয়া প্রণয়কুমারের প্রবেশ।

প্রণয়। চমৎকার ব্যবহার তো তোমার নিয়তি। আজ ফাল্গুনী অমাবস্যায় মা ভদ্রকালীর মানসিক পূজা। কত লোকজন আত্মীয়-স্বজন। এত আনন্দের মধ্যে যার সবার আগে আসা উচিত, সেই যদি না আসে—কি বলি বলো তো?

নিয়তি। এই তো আমি এসেছি।

প্রণয়। এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

নিয়তি। পূজামণ্ডপেই ছিলাম।

প্রণয়। সেখানে কি করছিলে শুনি?

নিয়তি। একজনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে হাসছিলাম।

প্রণয়। কেন?

নিয়তি। তাকে আমার ভাল লাগে, তাই।

প্রণয়। কে সেই লোকটা ?

নিয়তি। তোমাকে বলবো কেন ? তুমি আমার কে, যে সব কথা তোমাকে বলতে হবে !

প্রণয়। আমি তোমার কে ? একথা তুমি বলতে পারলে নিয়তি ? সেদিনের প্রতিজ্ঞার কথা কি তুমি ভুলে গেছো ? এই মা ভদ্রকালীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মায়ের পায়ের জবাফুল হাতে নিয়ে দুজনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমরা উভয়ে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবো !

নিয়তি। অত কথা আমার মনে থাকে না। পথ ছাড়ো।

প্রণয়। কোথায় যাবে ?

নিয়তি। সেই লোকটাকে দেখতে।

প্রণয়। কারণ ?

নিয়তি। বললাম না—তাকে আমার খুব ভাল লাগে !

প্রণয়। কি নাম তার ?

নিয়তি। তার নামটাও জান না ? তার নাম প্রণয়কুমার।

প্রণয়। নিয়তি !

নিয়তি। কি মজা ! কি রকম ঠকিয়েছি বল তো ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

প্রণয়। নিয়তি ! এখনও তোমার সেই ছেলেমানুষি গেল না ? তুমি যেন একটা কি !

নিয়তি। কি আবার ? আমি একটা মেয়ে। আর প্রণয়কুমারের ভাবী স্ত্রী।

প্রণয়। অর্থাৎ এ রাজ্যের ভাবী রাণী।

নিয়তি। না গো, না। রাণী হবার ইচ্ছা আমার নেই। কারণ

আমি যে গরীবের বোন, আমি চিরদিন তোমার দাসী হয়েই থাকতে চাই। বল—বল প্রণয়দা, আমার আশা তুমি পূর্ণ করবে? আমাকে তুমি বিবাহ করবে? কোনদিন দূরে সরিয়ে দেবে না?

প্রণয়। না নিয়তি, না। সারা পৃথিবী যদি একদিকে যায়, তবু ভালবেসে যাকে অন্তরে স্থান দিয়েছি, তাকে কি সারা জীবন ভুলতে পারি? না, তা কোনদিন পারবো না।

নিয়তি। কিন্তু তোমার পিতা এ রাজ্যের রাজা। আর আমার দাদা দীন দরিদ্র ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ। তোমার পিতা কি আমাকে পুত্রবধূর মর্যাদায়—

প্রণয়। পিতা কি করবেন জানি না। তবে পিতার পুত্রবধূরূপে তোমাকে চিরকাল এই যশোরের রাজপ্রাসাদেই রেখে দেবো। তার জন্যে যদি পিতার বিরোধিতা করতে হয়—তাও করব।

নিয়তি। না-না প্রণয়দা, আমার জন্যে পিতার প্রাণে এতখানি আঘাত হেনো না।

প্রণয়। নিয়তি!

নিয়তি। আমি ভাগ্যহীনা। চিরদিন দূর থেকেই তোমাকে ভালবেসে ধন্যা হবো। তবু আমি তোমাকে কর্তব্য থেকে দূরে সরে যেতে দিতে চাই না।

প্রণয়। নিয়তি!

নিয়তি। ওগো, প্রিয়জনের আঘাত যে সইতে পারে, সেই তো নারী!

প্রণয়। নিয়তি! কি বলছ তুমি পাগলের মত?

নিয়তি। ত্যাগেই যে শান্তি প্রণয়দা!

প্রণয়। এভাবে চোখের জলে মালা গেঁথে আর কতদিন আমাকে

সাজাবে নিয়তি? ছেলেবেলা থেকে শুধু একটা কথাই জেনে এসেছি, জীবনে-মরণে তুমিই আমার স্ত্রী।

নিয়তি। প্রণয়দা!

প্রণয়। পুজো শেষ হয়ে এলো। এবার চলো, আর এখানে অপেক্ষা নয়।

নিয়তি। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

প্রণয়। নিয়তি একা গেল! মায়ের কাছে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আমিও ওর পেছনে যাই। [প্রস্থানোদ্যত]

রামুর প্রবেশ।

রামু। কোথায় যাবে কুমার? তোমারই মানসিক পুজা—আর তুমিই আসন ছেড়ে উঠে এসেছ?

প্রণয়। তাতে কি হয়েছে? আমি আবার এখনই যাচ্ছি।

রামু। কিন্তু ওদিকে যে মহা সর্বনাশ ঘটতে চলেছিল।

প্রণয়। কি হয়েছিল রামুদা?

রামু। মায়ের বলির জন্যে নির্দিষ্ট পশুকে বাবাঠাকুর ছেড়ে দিয়েছে। ফলে আচার্য ভৈরবানন্দজী ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে বাবাঠাকুরকে হত্যা করতে যায়। আমি বাধা দেওয়ায় মায়ের আরতিও হতে পারেনি। তবে আচার্যের নির্দেশে বাবাঠাকুরকে বন্দী করে দরবারে নিয়ে গেছে।

প্রণয়। বলির পশুকে ছেড়ে দিয়ে বাবাঠাকুর তো সত্যিই অন্যায় করেছিল। আর তার শাস্তিবিধানে তুমিই বা বাধা দিতে গেলে কোন সাহসে?

রামু। আমার সাহসের কথা থাক। যদি প্রয়োজন হয়, সে পরিচয় একদিন দেবো।

প্রণয়। রামুদা!

রামু। তোমরা দেশের রাজা হয়েছ বলে যা খুশী তাই করতে পারো না কুমার! প্রজারাও মানুষ। তাদেরও স্বাধীন অধিকার আছে। আমরা তোমাদের রাজা বলে স্বীকার করি, তাইতো তোমরা রাজা। নইলে তোমরাও যা—আমরাও তাই।

প্রণয়। সত্যিই তাই। তুমি আমার দিব্যচক্ষু খুলে দিয়েছ রামুদা।

মুক্ত রমজানকে লইয়া কানাইয়ের প্রবেশ।

রমজান। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

রামু। একি বাবাঠাকুর! তোমাকে যে বন্দী করে রাজদরবারে নিয়ে গেল শাস্তি দিতে, তুমি তবে ছাড়া পেলে কি করে?

কানাই। কে কাকে শাস্তি দিতে পারে গো! আমি তো সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—চার যুগ ধরে দেখছি, শাস্তি দেওয়ার মালিক সেই একজন।

রামু। বড় বড় কথা বলছিস, কে তুই পুঁচকে ছোঁড়া?

কানাই।— গীত

নয়কো আমি পুঁচকে ছোঁড়া বেজায় বড়সড়।
জন্মেছি সেই আদ্যিকালে তোমার থেকেও বড়॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি,
ভজি আমি শুধুই কালী,
কালের মুখে দিয়ে কালি কৃষ্ণের নাম কর॥

রামু। কে তুই?

কানাই। আমি কানাই গো, কানাই। আমায় চেন না? বাড়ি আমার কৃষ্ণনগর, বৌয়ের নাম কমলা। আমি লক্ষীছাড়া বলে বৌ আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রণয়। থাকিস কোথায়?

কানাই। যে যখন আমায় ভালবেসে স্থান দেয়, তখন সেখানেই থাকি—সেইখানেই আমার ঘর-বাড়ি।

প্রণয়। [রমজানের প্রতি] আমি চলে যাচ্ছি। পুজার সময় অতিক্রান্তপ্রায়। আপনি যেই হোন, আমি কুমার প্রণয় রায়। আপনাকে এই যশোর রাজবাড়িতে দিয়ে গেলাম অবাধ অধিকার! যখনই ইচ্ছা হবে—তখনই আপনি আসবেন। কেউ যদি বাধা দেয়, তার শাস্তি হবে ভীষণ—ভয়ঙ্কর। আসুন মন্দিরে।

[প্রস্থান।

রামু। চল বাবাঠাকুর, কুমার প্রণয় রায় যখন নিজে ডেকে গেল তখন চল আমরা রাজবাড়িতেই যাই।

রমজান। কিন্তু আমাকে যে এখনই একবার ঠাকুরের কাছে যেতে হবে। ওই শোন, আমার দেরী দেখে ঠা[illegible] রকম অট্টহাসি হাসছে। তার হাসিতে আমার তালপাতার কুঁড়েটা থরথর করে কাঁপছে। আমি যাচ্ছি ঠাকুর, আমি যাচ্ছি। একটু অপেক্ষা কর নারায়ণ, অপেক্ষা কর। [ছুটিয়া প্রস্থান।

কানাই। যাও বাবাঠাকুর, এ যাত্রা খুব বেঁচে গেলে। [রামুকে] তুমিও যাও না, অযথা দেরী করে লাভ কি? রাত তো প্রায় শেষ হয়েই এলো।

রামু। তুই কোথায় যাবি?

কানাই। কোথায় আর যাব! দেখি চাকরি-বাকরি পাই কি না!

রামু। তোর আর কে আছে রে?

কানাই। বললাম তো—বৌ ছিল, আমি লক্ষ্মীছাড়া বলে সে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে আর আমার কেউ নেই।

রামু। তোর কথাগুলো তো ভারি মিষ্টি। যাবি তুই আমার সঙ্গে?

কানাই। কোথায়?

রামু। কেন রে, আমার বাড়িতে। তোর মত আমারও একটা ছেলে ছিল। নাম ছিল কানাই। হঠাৎ গাঁয়ে ওলাউঠা ঢুকলো। ব্যস, একরাত্রেই মা-ব্যাটা দুইই কাবার! এখন আছে শুধু আমার একটা ছোট্ট বোন। থাকবি আমার বাড়িতে?

কানাই। কেন থাকবো না? আমি তো থাকতেই চাই।

রামু। কি যেন নাম তোর?

কানাই। কানাই গো—কানাই।

রামু। আহা-হা! অবিকল তোরই মত ছিল আমার কানাই। আমি তাকে আদর করে কানু বলে ডাকতাম। সে মারা যাবার পর আমার মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে।

কানাই। তা তো হবেই, ছেলে বলে কথা!

রামু। তুই আয় আমার সঙ্গে। ছেলের মতই থাকবি। বাবাঠাকুরের পুজোর জোগাড় করবি, জল তুলবি, মন্দিরে ঝাঁট দিবি। বলি, আমার ছেলে থাকলে সেও তো এসব করতো। চল—চল আমার সঙ্গে।

কানাই। বেশ—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গৌড়ের দরবার

কথা বলিতে বলিতে হুকুম আলি ও
চাঁদ কাজীর প্রবেশ।

চাঁদ। এতদিন কোথায় ছিলে হে? ওর খোঁজ করছিলে বুঝি?

হুকুম। কার?

চাঁদ। কেন, যারা আমায় তামাসা করে। দ্যাখ—আমি তো আগেই বলে রেখেছি, যে আমার সঙ্গে তামাসা করে, তার মাথাটা তুমি বেমালুম কেটে নিয়ে এসো।

হুকুম। তাহলে—

চাঁদ। আমি তোমাকে যা দেবার তা তো দেবোই। আদিনাও বলেছে—একজনের মাথা যদি কাটতে পার তাহলে তোমাকে পেটপুরে বিরিয়ানি পোলাও খাওয়াবে।

হুকুম। কি যে সব বাজে বকেন। একে আমাদের চিন্তায় চিন্তায় মাথা খারাপ—

চাঁদ। মাথা খারাপ হয়েছে? হতেই হবে। শুধু কি একটা চিন্তা! আমি সুলতান হোসেন শার শ্বশুরজান, আদিনার আব্বাজান; ব্যাটারা আমাকে বলে কিনা হাবসী ক্রীতদাস! মাথা নেবো—হাতে মাথা নেবো। যদি না নিয়েছি, তবে আমার নাম চাঁদ কাজীই নয়।

হুকুম। আপনার হাতে এত ধার! দেখুন মেহেরবানী করে আপনার হাতটা আবার আমার গর্দানের দিকে বাড়াবেন না।

চাঁদ। আচ্ছা তোমার নামটা কি যেন?

হুকুম। হুকুম আলি।

চাঁদ। হেঃ-হেঃ-হেঃ! বাপু, এই তো তুমিও তামসা করছো।

হুকুম। কি বলছেন আপনি!

চাঁদ। হুকুম আলি, আদেশ মহম্মদ, তামিল বাহাদুর—এসব কি মানুষের নাম হয়? হ্যাঁ হে ছোকরা, সত্যি কথা বল তো, কি নাম তোমার?

হুকুম। বিশ্বাস করুন নাজির সাহেব, আপনি আমার বাপজানের সামিল। খোদার কসম বলছি, আমার নাম হুকুম আলি।

চাঁদ। আজ দেখছি তোমার নসীব খুব খারাপ। আমার হাত থেকে কেউ আজ তোমায় বাঁচাতে পারবে না। মাথা তোমার নেবোই নেবো। [হুকুম আলিকে পুনঃ পুনঃ ধরিতে যায়, সে ভয়ে ছোটাছুটি করিতে থাকে]

হুকুম। হায় বিসমিল্লা! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম।

পুরন্দর খাঁর প্রবেশ।

পুরন্দর। কেন হুকুম আলি?

হুকুম। এই যে উজির সাহেব! সেলাম। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

চাঁদ। উজির সাহেব তোমাকে বাঁচাবে? স্বয়ং আল্লাহতালা এলেও আজ আর তোমার নিস্তার নেই।

পুরন্দর। আহা, কি মুস্কিলে ফেললেন আপনারা। ভুলে যাচ্ছেন কেন, এটা দরবার!

হুকুম। কি ঝকমারী করে আজ দরবারে এসেছিলাম—বিনা অপরাধে উনি আমার মাথা নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন।

পুরন্দর। আচ্ছা তুমি এখন এসো, কে তোমার মাথা নেয়—পরে দেখা যাবে।

হুকুম। বহুৎ আচ্ছা! সেলাম—সেলাম।

[প্রস্থান।

চাঁদ। বিনা অপরাধে? ভাঁওতা দেবার আর জায়গা পাওনি? দাঁড়াও আমি—

নেপথ্যে নকীব। বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহান অধিপতি মির্জা মহম্মদ আলি আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কুলি খান বা-হা-দু-র—

হোসেনের প্রবেশ।

হোসেন। জান পুরন্দর খাঁ! আমি চিন্তা করে দেখলাম, তোমাকেই একবার দিল্লী পাঠানো প্রয়োজন। দিল্লীর অধীনস্থ সমস্ত খণ্ডরাজ্যের শাসনকর্তাদের ভারত সম্রাট আমন্ত্রণ করেছেন।

পুরন্দর। কিন্তু জাঁহাপনা! বাংলা তো আমাদের স্বাধীন রাজ্য, তবু কেন তিনি আপনাকে আমন্ত্রণ জানালেন?

হোসেন। সেটাই তো তাঁর গুরুতর অপরাধ। কিন্তু আমি মন্ত্রী রূপ গোস্বামী আর সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করেছি, তোমাকেই দিল্লী যেতে হবে।

পুরন্দর। কেন জনাব, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে?

হোসেন। শুধুমাত্র নিমন্ত্রণ রক্ষাই নয়, আমার পক্ষ থেকে তুমি নিমন্ত্রণ জানিয়েও আসবে।

পুরন্দর। নিমন্ত্রণ?

হোসেন। হ্যাঁ—তবে আতিথ্যের নয়, যুদ্ধের।

চাঁদ। আবার যুদ্ধ! আবার হানাহানি—রক্তপাত—বীভৎস মরণ

আর্তনাদ ? ভারি মজা হবে—ভারি মজা হবে। যাই—সংবাদটা একবার আদিনাকে জানিয়ে আসি। আর আমায় তামাসা করে একজন ধরা পড়েছে—তাও বলে আসি। [প্রস্থান।

হোসেন। তবে যদি সহজভাবে তিনি সারকীরাজ্য পুনর্মুক্ত করে জৌনপুরের হুশেন শাহকে বিনা দ্বিধায় তার রাজ্য ফিরিয়ে দেন, তবে যুদ্ধ হবে না।

পুরন্দর। কিন্তু সিকিন্দার লোদী—

হোসেন। অত্যাচারী, তবুও ইমানদার। তিনি নিজের ইমানকে জানের চেয়েও বেশী পেয়ার করেন। যাও, সব আয়োজন প্রস্তুত। তুমি এই মুহূর্তে দিল্লী যাত্রা কর।

পুরন্দর। তা যাচ্ছি ; কিন্তু জাঁহাপনা—

হোসেন। তোমার কোন ভয় নেই পুরন্দর খাঁ। কারণ তুমি সেখানে শুধু আমার প্রতিনিধি হয়েই যাচ্ছ না, যাচ্ছ দূত হয়েও। আর আমি জানি রাজনীতিতে সিকিন্দার লোদী যথেষ্ট পারদর্শী। এই নাও যুদ্ধের আমন্ত্রণপত্র। [পত্রদান]

পুরন্দর। জয় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের জয় !

[প্রস্থান।

হোসেন। দুষমন ! দুষমন ! ঘরে বাইরে চতুর্দিকে যেন দুষমনদের বেড়াজাল সৃষ্টি হয়েছে। বাইরের দুষমনদের গতিরোধ করা যায় শক্তি দিয়ে—সামর্থ্য দিয়ে। কিন্তু ঘরের দুষমন দমন করতে চাই সূক্ষ্ম বুদ্ধি। আজ দেওয়ান ভাবনা কাজীর স্পর্ধার সীমা—

ভাবনা কাজীর প্রবেশ।

ভাবনা। বান্দার সেলাম পৌছে জনাব।

হোসেন। একি দেওয়ান সাহেব! সহসা দরবারে কেন?

ভাবনা। একটা খবর দিতে।

হোসেন। কিসের খবর বল।

ভাবনা। সাহসপুরের সাহেব আলি মোল্লাকে মনে পড়ে জাঁহাপনা?

হোসেন। কেন, সে আবার কি করেছে?

ভাবনা। সে করেনি। তার পুত্র রমজান পবিত্র ইসলাম ধর্মের অপমান করে কাফের হিন্দুর ঠাকুরদের নামগান করে বেড়াচ্ছে। তাই তামাম সাহসপুরের সমস্ত ইসলাম সম্প্রদায় আর হিন্দুরা তাকে একঘরে করে। কেউ বলে ম্লেচ্ছ, কেউ বলে কাফের। তাই ধিক্কার সইতে না পেরে সে সাহসপুর ত্যাগ করে যশোহরে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

হোসেন। সেকি দেওয়ান সাহেব! মুসলমান হয়ে কাফেরের—

ভাবনা। একথা জানতে পেরে, রাজা প্রতাপ রায় জানিয়েছেন যে, যদি বাংলার সুলতান এর কোন প্রতিকার না করেন, তাহলে তিনিও আর খাজনা দেবেন না।

হোসেন। এতবড় বেয়াদব সেই রমজান! আমি তাকে বন্দী করে এনে কঠোর শাস্তি দেবো।

ভাবনা। আপনি আমাকে হুকুম দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন বঙ্গেশ্বর! আমি সেই বেয়াদবকে বন্দী করে দরবারে হাজির করবো।

হোসেন। না দেওয়ান সাহেব। এই সামান্য কাজের জন্যে তোমাকে বিব্রত করতে চাই না। তুমি এ কাজের জন্যে হাবিলদার হাতেম আলি খাঁকেই নিযুক্ত কর।

ভাবনা। তবে তাই হোক। কিন্তু এর জন্যে প্রকৃত অপরাধী কে জানেন জাঁহাপনা?

হোসেন। কে ?

ভাবনা। ওই কাফের হিন্দুরা।

হোসেন। তাই নাকি ?

ভাবনা। জী হজরৎ। তবে যদি আপনার হুকুম পাই, মাত্র দু' বছরের মধ্যে আমি এই হিন্দুস্থানের জমিনে হিন্দুর 'হ' পর্যন্ত রাখবো না। মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়বো, পাথরের পুতুলগুলোর ঘাড়ে ধরে ছুঁড়ে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবো।

হোসেন। দেওয়ান ভাবনা কাজী! জন্মে আমি ইসলাম হলেও জাতিতে এখনও বাঙালী। হিন্দুধর্মের এবাদৎ করি না বলে তাদের এনকারও করি না। যাক সেকথা। হাতেম আলিকে আমার আদেশ জানিয়ে বলবে যে, রমজানকে সে যেন ধরে নিয়ে আমার সামনে হাজির করে। [প্রস্থানোদ্যত]

ভাবনা। সে ব্যবস্থাই করবো জাঁহাপনা।

হোসেন। হ্যাঁ শোন। আর তা যদি না পারে তাহলে ছলে বলে কৌশলে সে যেন তাকে গুপ্তহত্যা করে। আর তার জন্তে তাকে আমার নামাঙ্কিত ছুরিকা প্রদান করবে।

[প্রস্থান।

ভাবনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সুলতান—সুলতান। হোঃ-হোঃ-হোঃ! সুলতান হোসেন শাহ! তোমার রাখালি করাই সাজে, সুলতানী করা সাজে না। তাই তোমার ওই সুলতানী চিরতরে ঘুচিয়ে দিয়ে তোমাকে কবরে পাঠিয়ে আমিই হবো বাংলার সুলতান—তবেই আমার নাম ভাবনা কাজী।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সাহসপুর থানা

চাবুক হস্তে দ্রুত জালিমের প্রবেশ।

জালিম। অপদার্থ কর্মচারীর দল। সামান্য একজন চাষীকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিয়ে পাঠালাম হাবিলদারকে। আর সে বেয়াদব কিনা তাদের বাপ-বেটি দুজনকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে!

আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। সেলাম থানাদার। এখন বল—কেন আমাদের বাপ-বেটিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ধরে আনতে হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছিলে?

জালিম। উত্তেজিত হলে তোমাকে ভাল মানায় দেখছি! বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা!

আলেয়া। আগে আমার কথার জবাব দাও।

জালিম। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছ দেখছি। তাহলে শোন। আচ্ছা, তুমি রমজানকে তোমার জান দিয়ে পেয়ার করতে, তাই না?

আলেয়া। সে খোঁজে তোমার প্রয়োজন কি? এ অঞ্চলের থানাদার তুমি, প্রজার ব্যক্তিগত ব্যাপার তোমার তো জানার কথা নয়।

জালিম। আমি যা জানতে চাই, তার জবাব দাও। বল, রমজানকে তুমি পেয়ার করতে?

আলেয়া। হ্যাঁ, আজও করি, আর চিরদিনই করবো।

জালিম। আমি তোমার মহব্বতকে জিন্দাবাদ জানাই। অথচ সেই রমজান এমনই বেইনসাফ বেয়াদব বেতমিজ যে, তোমার মহব্বতের কোন দামই দিলে না। আর তোমাকে সাদি করার ভয়ে সে সাহসপুর ত্যাগ করলো?

আলেয়া। সাহসপুর ত্যাগ করে সে কতদূর যাবে? সে সব সময় আছে আমার দীলমহলের মণিকোঠায়। আমি চোখ বুজলেই তাকে দেখতে পাই।

জালিম। ওসব মন ভোলানো কথা রেখে দাও বিবিজান। ভেবে দেখ, যে তোমাকে এতখানি আঘাত দিয়েছে, যে তোমার রূপলাবণ্যকে প্রকারান্তরে ঘৃণা করে অবহেলায় দূরে সরে গেছে, তার জন্যে অযথা জিন্দেগীটা বরবাদ করবে কেন?

আলেয়া। থানাদার!

জালিম। মৃগনাভিপ্রাপ্তা চঞ্চলা হরিণী তুমি। তাই নিজেকে চিনতে পার না। তুমি অপরূপ হুরী, কিন্তু অন্ধ; তাই নিজের রূপের মূল্য বোঝ না। তুমি উজ্জ্বল হীরকখণ্ড, তাই আজ যে তোমাকে আমার কতখানি প্রয়োজন, সেকথা চিন্তা করার ক্ষমতাও তোমার নেই।

আলেয়া। তুমি বয়েৎ রচনা কর থানাদার, আমি ফিরে এসে একদিন শুনে যাবো।

জালিম। আমার কথায় রহস্য করো না আলেয়া! তুমি বিশাল কস্তুরীসমা, তোমার সৌরভে কত পুরুষ মাতাল হবে, তোমার স্পর্শে দুনিয়া পাগল হয়ে যাবে। কেন তুমি এভাবে তিল তিল করে নিজেকে ধ্বংস করতে চাইছ? শোন আলেয়া! তুমি আমায় সাদি কর, আমি তোমায় হারেমের খাস বেগম বানিয়ে রাখব।

আলেয়া। বেগম বানাবে—

জালিম। তুমি বিশ্বাস কর আলেয়া! খোদার কসম—যদি তুমি আমাকে সাদি কর, জবান দিলাম—তোমায় খুশী করতে এই সাহসপুর ছেড়ে আমি তোমাকে নিয়ে সুদূর কাশ্মীর চলে যাব।

আলেয়া। থানাদার!

জালিম। কথা দাও আলেয়া, অমত করো না। সেদিন রমজানের জন্যে তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে। কিন্তু আজ আমায় সাদি করতে বাধা কোথায়? তোমার এ রূপ দুনিয়ার এক অভিনব সৃষ্টি।

আলেয়া। কেন, তোমার হারেমে কি রূপসী বেগম নেই? যে রূপ প্রকৃতির দান, সে রূপ কি বেগম-হারেমে দুষ্প্রাপ্য?

জালিম। সত্যিই তাই। রূপ আছে অনেকের, কিন্তু তোমার রূপের কাছে তাদের তুলনা হয় না।

আলেয়া। তারাও ঔরত—আমিও ঔরত, তবে তাদের সঙ্গে আমার তফাৎ কোথায়?

জালিম। গোলাপও ফুল আর শিমূলও তো ফুল। কিন্তু দুটোর রঙে গন্ধে কি ফারাক নেই? সত্যিই তোমার সৌন্দর্যের তুলনা হয় না বিবিজান! তাছাড়া আমিও তোমায় সাদি না করলে শান্তি পাব না।

আলেয়া। তুমি আমায় এত মহব্বৎ কর থানাদার জালিম কাজী?

জালিম। সত্যিই পিয়ারী, তুমি আমার দীলকি খোয়াব, তুমি আমার আঁখের রোশনী, মহব্বতকি খেলোয়াড়। তোমায় না পেলে বেহেস্তে গিয়েও আমার শান্তি নেই। তোমার রূপ আমায় উন্মাদ মাতাল করেছে বিবিজান।

আলেয়া। আচ্ছা থানাদার! আমি না হয়ে এ রূপ যদি তোমার

বহিনের থাকতো, পারতে তাকে তুমি সাদি করে শান্তি উপভোগ করতে?

জালিম। আ-লে-য়া! [হাত হইতে চাবুক পড়িয়া গেল]

আলেয়া। আলেয়া নয় ভাইজান—বল বহিন।

জালিম। বহিন?

আলেয়া। হ্যাঁ, তুমি আমার ভাইজান, আর আমি তোমার পেয়ারের ছোট্ট বহিন।

জালিম। বহিন!

আলেয়া। হ্যাঁ, বহিন। আর তুমি আমার পেয়ারের ভাইজান।

জালিম। এ তুমি কি করলে আলেয়া? তামাম দুনিয়া জানে আমি মগুপ লম্পট চরিত্রহীন। তাই সকলেই দূর থেকে আমাকে এনকার করে, থুৎকার দেয়। কিন্তু কেউ তো এমনি করে আমার এ ভুলটা ভাঙিয়ে দেয়নি। কেউ তো বলেনি যে, দুনিয়ায় যত ঔরত আছে, তারা সকলেই ভোগের পাত্রী নয়—তাদের মধ্যেও লুকিয়ে আছে আমার মা—আমার বহিন।

আলেয়া। ভাইজান! অন্ধকার থেকে যখন আলোর সড়ক দেখতে পেয়েছ, তখন আর ভুলেও যেন আঁধার গহ্বরে ঝাঁপ দিও না।

জালিম। ঠিক বলেছ বহিন—ঠিক বলেছ। নিজের তৃষ্ণায় সরাপ পান করি, আর লোকে বলে মাতাল—অমানুষ। বিশ্বাস করো বহিন, তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে খোদাতালার নামে কসম খেয়ে ওয়াদা নিলাম, যে সরাপ মানুষকে অমানুষ করে, আজ থেকে সে সরাপ আমি আর পান করবো না।

আলেয়া। মেহেরবান খোদার কাছে মোনাজাত জানাই, তিনি যেন আমার ভাইজানকে প্রকৃত মানুষ করেই গড়ে তোলেন।

জালিম। কই হ্যায়! বন্দী—

বন্দী সাহেব আলি সহ হাতেম আলির প্রবেশ।

জালিম। হাতেম! শৃঙ্খল মুক্ত করে দাও।

[হাতেমের তথাকরণ ও প্রস্থান।

সাহেব। খোদা! আজব তোমার দুনিয়া। একজন মাতাল লম্পট চরিত্রহীন কিনা আমাদের থানাদার! আর—

আলেয়া। না—না বাপজান! থানাদার মাতালও নয়, লম্পটও নয়—একজন প্রকৃত মানুষ। আর এখন থেকে ও আমার ভাইজান, আমি ওর বহিন।

সাহেব। একি সত্যি?

জালিম। বিশ্বাস কর চাচা, কসম খোদা, তোমার বেটি আমার বহিন—পেয়ারের বহিন।

সাহেব। বহিন?

জালিম। হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, তোমার বেটি এতবড় শয়তানী যে, সামান্য আঘাতে একজন মাতাল লম্পটের অকালমৃত্যু ঘটিয়েছে। আর সেই মরা দেহ থেকে নতুন করে জন্ম নিয়েছে, মানুষ জালিম কাজী।

সাহেব। শোভানাল্লা! একি আমি খোয়াব দেখছি? আচ্ছা বেটা, কেউ যদি তোর বহিনকে বেইজ্জত করতে চায়?

জালিম। আমি তাকে কোতল করব।

সাহেব। যদি সে তোর ভাইসাহেব হয়?

জালিম। তারও রেহাই নেই। হোক সে জানের জান, হোক সে নবাবের পেয়ারের কর্মচারী; তবু যে আমার বহিনের বেইজ্জতি করতে চাইবে, তাকে আমি কিছুতেই রেহাই দেবো না।

সাহেব। খোদা তোর মঙ্গল করুন।

জালিম। যাও বহিন! মঞ্জিলে ফিরে যাও। যদি কোন শয়তান তোমার এতটুকু ক্ষতি করার জন্যে কোনদিন হাত বাড়ায়, তুমি কাকের মুখে সংবাদ দিলে, সেই মুহূর্তে আমি আমার ফৌজ নিয়ে উল্কার বেগে ছুটে যাব। তার শির নিয়ে তাজা খুনে তোমার পা ধুইয়ে দেবো।

আলেয়া। চল বাপজান।

সাহেব। হ্যাঁ, চল বেটি চল পথে যেতে যেতে আমি সবাইকে ডেকে বলবো—আমি থানাদার জালিম কাজীর চাচাজান। যে তাকে অমানুষ বলবে, এই জিন্নতযাত্রী বুড়ো সাহেব আলি মোল্লা তাকে টুঁটি টিপে কবরের পথ দেখিয়ে দেবে।

[প্রস্থান।

আলেয়া। আমিও খোদাতালার কাছে এই আরজ জানিয়ে যাই—আমার এই ভাইজানকে এমন মহান করে গড়ে তোল, দুনিয়ার কেউ যেন তাকে অমানুষ বলার সাহস না রাখে। এখন আসি ভাইজান! সেলাম—

[প্রস্থান।

জালিম। দীন দুনিয়ার মালিক মেহেরবান খোদা! জিন্দেগীতে কোনদিন তোমায় ডাকিনি। আমার হাজারো কসুর মাফ করো দুনিয়াদার। আমি গুণাহকর বান্দা ঔরতলোভী লম্পট। তাইতো তোমার এবাদৎ করার সুযোগ পাইনি। তুমিই যখন সামান্য আঘাতে আমার মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে দিয়েছ, এবার আমায় প্রকৃত মানুষ গড়ে মানুষের সেবার উৎসর্গ কর মালিক, মানুষের সেবায় উৎসর্গ কর।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লীর দরবার

কথা বলিতে বলিতে রহমৎ ও পুরন্দরের প্রবেশ।

রহমৎ। বল—কি প্রয়োজন?

পুরন্দর। আমি বাংলার সুলতানের প্রতিনিধিরূপে শাহানশার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

রহমৎ। অপেক্ষা কর, এখনই শাহানশাহ দরবারে আসবেন। কিন্তু কি নাম তোমার?

পুরন্দর। আমি বাংলার উজির পুরন্দর খাঁ।

বৈরাম লোদীর প্রবেশ।

বৈরাম। রহমৎ খাঁ—

রহমৎ। একি শাহজাদা!

পুরন্দর। শাহজাদা?

রহমৎ। হ্যাঁ, ইনিই শাহজাদা, জনাব লোদী বৈরাম-এ-আলম বাহাদুর।

পুরন্দর। বন্দেগী শাহজাদা। [অভিবাদন]

বৈরাম। তোমার পরিচয়?

রহমৎ। ইনি বাংলার উজির পুরন্দর খাঁ।

বৈরাম। দরবারে কি প্রয়োজন?

রহমৎ। সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

নেপথ্যে নকীব। দিল্লীশ্বরোবা—জগদীশ্বরোবা ভারত সম্রাট জনাব লোদী সিকিন্দার-এ-আলম বাহাদুর—

সিকিন্দার লোদীর প্রবেশ। সকলের অভিবাদন।

সিকিন্দার। সিপাহশালার রহমৎ খাঁ—

রহমৎ। হুকুম করুন সম্রাট!

বৈরাম। ভাইজান!

সিকিন্দার। মনসবদার বৈরাম লোদী! এটা দরবার। দরবারে আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবের স্থান নেই। ভাইজান আমি তোমার মহালে প্রাসাদে, দরবারে নয়।

বৈরাম। গোস্তাকি মাফ হয় আলিজা।

সিকিন্দার। রহমৎ খাঁ! ইনি—

রহমৎ। অন্যান্য দেশের শাসকদের মত বাংলার সুলতানও আপনার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে তাঁর প্রতিনিধিরূপে বাংলার উজির পুরন্দর খাঁকে পাঠিয়েছেন।

পুরন্দর। গ্রহন করুন সম্রাট, বাংলার সুলতানের পক্ষ থেকে এই সামান্য শুভেচ্ছার নিদর্শন। [রত্নহার দান]

সিকিন্দার। সুলতানকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবেন উজির সাহেব।

পুরন্দর। একটা আর্জি আছে জনাব।

সিকিন্দার। পেশ করুন।

পুরন্দর। বাংলার সুলতান আপনাকে একটি পত্র প্রেরণ করেছেন জাঁহাপনা। [পত্র বাহির করিল]

সিকিন্দার। বাংলার সুলতানের পত্রপাঠ কর রহমৎ খাঁ।

রহমৎ। [পুরন্দরের হাত হইতে পত্র লইয়া পাঠ] মহামান্য শাহেনশাহ বাহাদুর! দীন গোলামের হাজারো সেলাম পৌছে। আমার একটিমাত্র জিজ্ঞাসা, আপনার পিতা সম্রাট বহলুল লোদী সারকী রাজ্য আক্রমণ করে জৌনপুরের সুলতান হুশেন শাহকে মসনদচ্যুত করেছিলেন। তাই আমি কেবল জানতে চাই যে, স্বেচ্ছায় আপনি সারকী রাজ্যের অধিকারমুক্ত করে জৌনপুরের হুশেন শাহকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন কিনা। [পত্রখানি সিকিন্দারের হাতে দিল]

সিকিন্দার। এ তো বড় চিন্তার কথা। পিতার অধিকৃত সারকী রাজ্য স্বেচ্ছায় মুক্ত করবো কিনা—বঙ্গেশ্বর তা জানতে চেয়েছেন। তোমার কি অভিমত মনসবদার বৈরাম লোদী?

বৈরাম। বেহেস্তগত ভারত সম্রাট বহলুল লোদীর শেষ বিজয় কীর্তি সারকী রাজ্য। তাকে আমরা সামান্য একটা মুখের কথায় অধিকার মুক্ত করতে পারি না।

সিকিন্দার। কিন্তু তা না করলে যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

বৈরাম। প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে।

সিকিন্দার। তা হয় হোক। কিন্তু মসনদে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই—

বৈরাম। তাছাড়া উপায় কি?

সিকিন্দার। সিপাহশালার রহমৎ খাঁ, তুমি কি বল?

রহমৎ। ভারত সম্রাটকে উপদেশ দেওয়া আমি ধৃষ্টতা মনে করি। তবে বন্ধুত্বের চেয়ে পরম সম্পদ দুনিয়ায় আর কিছুই নেই হজরৎ। তাই বলে কেউ যদি বন্ধুত্বের সুযোগে ক্ষতি করার মতলবে হাত বাড়ায়, তার হাত কেটে নেওয়ার মত শক্তিও রাখা প্রয়োজন।

সিকিন্দার। সত্যিই তাই। শুনুন উজির সাহেব! আপনি মুসাফিরখানায় অপেক্ষা করুন, এখনই বঙ্গেশ্বরের পত্রের উত্তর লিখে পাঠাচ্ছি।

পুরন্দর। বহুতাচ্ছা! খোদা হাফেজ—খোদা হাফেজ!

[প্রস্থান।

সিকিন্দার। রহমৎ খাঁ! মুন্সিকে গিয়ে আমার হুকুম জানাও যে, সারকী রাজ্য আর জৌনপুর—সুলতান হুশেন শাহকে আমি স্বেচ্ছায় দান করলাম—এই মর্মে পত্র লিখে আমার সীলমোহর দিয়ে যেন বাংলার দূতের হাতে প্রেরণ করা হয়। আরও যেন লেখা থাকে যে, বাংলার সুলতানকে আমি দোস্ত বলেই মেনে নিয়েছি।

রহমৎ। বেশ তাই হবে হজরৎ। এখনই মুন্সির কাছ থেকে পত্র লিখে বাংলার দূত মারফত সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে প্রেরণ করছি।

[প্রস্থান।

বৈরাম। এত সহজে একটা রাজ্য হাতছাড়া করা উচিত হলো শাহানশা?

সিকিন্দার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বৈরাম, ঠিক এই কারণেই তুমি মনসবদার আর আমি ভারত সম্রাট। শোন, বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাঙালী নয়, আফগান। তাই বাংলার প্রতি তার দরদ কম। কিন্তু আমি ভারত সম্রাট। ভারতের মধ্যে একটি সোনার রাজ্য হলো এই বাংলাদেশ। তাই সেদেশের প্রতি আমার চিরদিনের লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। যে কোন উপায়েই হোক, বাংলা আমার চাই-ই চাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বৈরাম। কিন্তু কি করে তা সম্ভব?

সিকিন্দার। অসম্ভবকে সম্ভব করার নামই তো রাজনীতি। শোন,

বাংলাদেশ চারটি অঞ্চলে বিভক্ত। এই মুহূর্তে তোমাকে পূর্বাঞ্চল দিয়ে বাংলা রওয়ানা হতে হবে। আমি তোমাকে মানচিত্র বুঝিয়ে দিচ্ছি।

বৈরাম। উদ্দেশ্য ?

সিকিন্দার। সেখানে গিয়ে তুমি অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দেবে। হত্যায় লুণ্ঠনে নির্যাতনে বাংলার বুকে বিভীষিকা সৃষ্টি করবে।

বৈরাম। কিন্তু—

সিকিন্দার। এতে আর কিন্তু নেই বৈরাম! যত খুশী ফৌজ নিয়ে যাও। এমন শক্তি সংগ্রহ করে যাও, যেন যে-কোন শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে পার। আর শোন, মাঝে মাঝে কর্মচারীদের সম্মুখে তোমাকে কটুকথা বলি, তার জন্যে মনে যেন ব্যথা পেয়ো না। আর ভুলে যেও না, ভারতের মসনদে তোমার আমার সমান অধিকার। এটাও জেনে রাখ—তোষামোদপ্রিয় কর্মচারীদের হাতের মুঠোয় রাখতে, আর তাদের দিয়ে দুরূহ কাজ উদ্ধার করতে—নিজের প্রিয়-জনদের অমন অনেক কিছুই বলতে হয় ভাইজান।

বৈরাম। আমি আগে একথা বুঝতে পারিনি ভাইসাহেব। তার জন্যে তুমি আমাকে মাফ করো।

সিকিন্দার। যাও বৈরাম, তৈরী হয়ে নাও। ইয়াদ রেখ, তুমি চলে যাবার পরেই আমি ঘোষণা করে দেবো যে, ভারতের মসনদ নিয়ে আমার সঙ্গে বিবাদ করে বৈরাম লোদী মনসবদারীতে ইস্তফা দিয়ে স্বেচ্ছায় দিল্লী পরিত্যাগ করেছে।

বৈরাম। ভাইসাহেব!

সিকিন্দার। কিন্তু বিশ্বাস কর ভাইজান! খোদার কসম, এই মসনদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই আমি চাই বাংলা জয়

করতে। চিন্তা করো না, তোমাকে আমি কোনদিন তোমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবো না।

বৈরাম। ভাইসাহেব!

সিকিন্দার। বিশ্বাস না হয়, তুমি বসো ভারতের মসনদে—আমি যাই বাংলায়।

বৈরাম। না-না ভাইসাহেব! মসনদে বসে শাসন করার মত ক্ষমতা আমার নেই। আমি বরং বাংলার পথে যাত্রা করছি তোমার মসনদ নিষ্কণ্টক করতে। [প্রস্থানোদ্যত]

সিকিন্দার। কিন্তু মনে থাকে যেন বৈরাম লোদী, দেওয়ালেরও কান আছে। ভারত সম্রাট সিকিন্দার লোদীর কলঙ্ক ঘোষণায় তোমার কলঙ্কও কম হবে না।

বৈরাম। সেজন্যে তুমি চিন্তা করো না ভাইসাহেব। তোমার হুকুম তামিল করতে বৈরাম লোদীর জান কবুল।

[প্রস্থান।

সিকিন্দার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মূর্খ! বৈরাম লোদী ছুটে চললো পূর্বাঞ্চল দিয়ে বাংলার ওপর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিতে। বিমাতার সন্তান হিসাবে ভারতের মসনদে তারও অর্ধেক অধিকার। বেশীদিন দিল্লীতে থাকলে বৈরাম হয়তো রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো। তাই বাঙালীদের হাতেই বাংলার মাটিতে তাকে কবর নিতে পাঠালাম হাঃ-হাঃ-হাঃ! কই হ্যায়, সিপাহশালার রহমৎ খাঁ—

রহমতের পুনঃ প্রবেশ।

রহমৎ। রহমৎ খাঁ হাজির সম্রাট।

সিকিন্দার। রহমৎ খাঁ! বড় দুঃসংবাদ।

রহমৎ। কি হুজুরৎ?

সিকিন্দার। বাংলার সুলতানের সঙ্গে দোস্তির সন্ধিপত্র লিখে দেওয়ায় আর বিনাসর্তে জৌনপুরের হুসেন শাহের সারকীরাজ্য পুনর্মুক্ত করায়, আমার বৈমাত্র ভ্রাতা—দিল্লীর পঞ্চাশ হাজারী মনসবদার বৈরাম লোদী ক্ষিপ্ততা প্রকাশ করে, এই মুহূর্তে নোকরীতে ইস্তফা দিয়ে দরবার পরিত্যাগ করেছে।

রহমৎ। সে কি জাঁহাপনা! তাহালে উপায়?

সিকিন্দার। আমার একান্ত বিশ্বাস, হয়তো সে বাংলা আক্রমণ করে—বাংলার ওপর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দেবে। তাই আমার হুকুমনামা নিয়ে তুমি এখনই তার পশ্চাদ্ধাবন কর।

রহমৎ। জাঁহাপনা—

সিকিন্দার। আমার দোস্ত বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের কাছে শাহজাদার পরিণতির কথা জানাবে। যদি সে বাংলার ওপর কোন রকম অত্যাচার করে, তাহলে তাকে যেন বাংলার মাটিতেই কবর দেওয়া—না-না, থাক। তাকে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে এসো। হাজার হোক, সে আমার পিতার ঔরসজাত সন্তান।

রহমৎ। বেশ, তাই হবে জনাব। কিন্তু আমি কোন পথে বাংলা যাত্রা করবো?

সিকিন্দার। তুমি—তুমি উত্তরাঞ্চল দিয়ে যাও। আমার মনে হয় পথিমধ্যে বৈরাম লোদীর সাক্ষাৎ পাবে। যদি পাও—তাহলে যে কোন উপায়েই হোক, তাকে বন্দী করে দরবারে হাজির করা চাই। তোমার যত ফৌজ দরকার হয় সঙ্গে নিয়ে যাও। তবে দেখো, যেন ভারত সম্রাটের উন্নত শির কিছুতেই নত না হয়।

রহমৎ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হুজুরৎ। নিমকের মর্যাদা রাখতে

আমি দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত হাসতে হাসতে বিসর্জন দেবো, তবু আপনার উন্নত শির জ্ঞান থাকতে নত হতে দেবো না।

[প্রস্থান।

সিকিন্দার। দীন দুনিয়ার মালিক মেহেরবান খোদা! সবই তোমার মেহেরবানী। তুমি আমায় যা বলাচ্ছ তাই বলছি; তুমি যা করাচ্ছ তাই আমি করছি। এতে যদি আমার কোন গুণাহ হয়, সে কসুর তুমি মাফ করো মালিক—সে কসুর তুমি মাফ করে দিও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রামুঠাকুরের বাড়ির সম্মুখ

ফুলের মালা হাতে নিয়তির প্রবেশ।

নিয়তি। আজ শুভ রাসপূর্ণিমা। বাবাঠাকুরের কুঁড়েটা আমি আর কানাই ফুলে ফুলে সাজিয়েছি। সদাই নাম সংকীর্তন হচ্ছে: কত লোক আসছে আর যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। আমি নিজের হাতে মালা গেঁথে রেখেছি। গঙ্গাস্নান করে এসে বাবাঠাকুর পূজোয় বসবে, তার ঠাকুরকে সাজাবে। সেই ফাঁকে আর একটা মালা গেঁথে রেখেছি আমার মনের ঠাকুরকে সাজাব বলে।

প্রণয়ের প্রবেশ।

প্রণয়। আর বোধহয় তোমার সে আশা পূরণ হবে না নিয়তি।

নিয়তি। কি হলো প্রণয়দা ?

প্রণয়। নবাবের কর্মচারী এসেছে বাবাঠাকুরকে গ্রেপ্তার করতে।

নিয়তি। বাবাঠাকুরের অপরাধ ?

প্রণয়। দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অপরাধ না করলেও—নবাবের দৃষ্টি যখন পড়েছে তখন তাকে গ্রেপ্তার করবেই।

রামুর প্রবেশ।

রামু। কিন্তু কুমার! রাজ্যে প্রবেশ করে রাজার হুকুম না নিয়ে তার কোন প্রজাকে গ্রেপ্তার করার অধিকার নিশ্চয়ই সুলতানেরও নেই

প্রণয়। একথা সত্যি রামুদা।

রামু। সেই বে-আক্কেল নবাবের দূত বাবাঠাকুরকে না পেয়ে তার ঠাকুরঘর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ঠাকুরগুলোকে যখন ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল, সেই মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত হলাম আমি। আমার লাঠির এক ঘায়ে তার তলোয়ার মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই, সে পালিয়ে গেল।

নিয়তি। কিন্তু দাদা, সেও কি তোমাকে সহজে ছেড়ে দেবে ?

প্রণয়। ঠিক বলেছ নিয়তি, সহজে সে ছেড়ে দেবে না। হয়তো এবার সে নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে এসে সমস্ত যশোহরের ওপর অত্যাচার শুরু করবে।

নিয়তি। কুমার! সমস্ত যশোহরের প্রজা কি একজোট হয়ে সেই যবনের অত্যাচার থেকে নিজের পরগণাকে বাঁচাতে পারবে না ?

রামু। যাও নিয়তি, তুমি মন্দিরে যাও। আজ রাসপূর্ণিমা।

কত লোক এসেছে ঠাকুরকে ফুল-চন্দন দিয়ে সাজাতে। তারা এসে কুঁড়ের এই অবস্থা দেখে হয়তো ফিরে যাবে।

নিয়তি। যাচ্ছি। কিন্তু বাবাঠাকুরের ঠাকুরঘর যারা ভেঙে দিয়েছে, যারা বাবাঠাকুরকে বন্দী করতে এসে—তাকে না পেয়ে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, তাদের শাস্তিবিধান যদি তোমরা না করতে পার, তাহলে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের অভিশাপ তোমাদের মাথায় বর্ষিত হবে।

[প্রস্থান।

প্রণয়। নিয়তি ঠিক কথাই বলেছে রামুদা। গ্রামে গ্রামে সাড়া জাগিয়ে দাও, এই অত্যাচারী যবনদের শাস্তিবিধান আমাদের করতেই হবে।

হুকুম আলির প্রবেশ।

হুকুম। বান্দার সেলাম গ্রহণ করুন কুমার বাহাদুর।

প্রণয়। কে তুমি ভাই?

হুকুম। দীন বান্দার নাম হুকুম আলি। আমি বাংলার সুলতানের বিশতঙ্কা বেতনের কর্মচারী। কিন্তু আপনি আমাকে ভাই বললেন যে?

প্রণয়। বাংলায় বাঙালীরা সকলেই সকলের ভাই।

রামু। এখন তোমার আগমনের উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত কর।

হুকুম। সুলতানের হুকুমে হাবিলদার হাতেম আলি খাঁ এসেছিল আসামীকে গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু তার কাজে বাধা দিয়ে সুলতানের অপমান করেছেন আপনি।

প্রণয়। রাজকাজে এসে পরগণার রাজার সঙ্গে পরামর্শ না করে

আসামী খোঁজ করা যে কতবড় অপরাধ, সেকথা কি তোমরা একটি-বারও চিন্তা করেছ ? না কি তোমাদের মহামান্য সুলতান তোমাদের সে সহবৎ শেখাননি ?

হুকুম। বান্দার গোস্তাকি মাফ হয় কুমার বাহাদুর। আমি রাজাসাহেবের স্বাক্ষরিত পত্র নিয়েই এসেছি। এবার মেহেরবানী করে হুকুম করুন, আমি আসামী রমজানকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাই।

প্রণয়। রমজান ! রমজান আবার কে ?

হুকুম। যাকে গ্রেপ্তার করতে সুলতান পাঠিয়েছিলেন। অথচ—

রামু। সে তো আমাদের বাবাঠাকুর।

প্রণয়। তাছাড়া হিন্দুর নাম কখনো রমজান হয় নাকি ? সে তো—

হুকুম। মুসলমান। তোমরা যাকে বাবাঠাকুর বলে জান, আসলে সে হিন্দু নয়, মুসলমান।

রামু ও প্রণয়। মুসলমান !

হুকুম। বিশ্বাস কর ঠাকুর, আমি জিন্দেগীতে কখনও ঝুট বলিনি, আর বলবোও না। তোমাদের কাছে সে হয়তো পরিচয় গোপন করেছিল নিজেকে বাঁচাতে। কিন্তু তার নাম রমজান।

প্রণয়। সেকি ! একজন ধার্মিক মুসলমান হয়ে হিন্দুর—

হুকুম। ভেবে দেখ হিন্দু ভাইজান ! যে তোমাদের ঈমান ধরম নিয়ে খেলা করতে চায়, যে তোমাদের পবিত্র ধর্মে কলঙ্ক মাখাতে চায়, নিজের পরিচয় গোপন করে তোমাদের বেয়াকুব বানিয়ে যে তোমাদের সঙ্গে এতবড় বেইমানি করেছে, তাকে কি তোমরা রেহাই দেবে ? তোমরা কি কখনও তার নাম জানতে চেয়েছ ?

রামু। কই, নাম তো কখনও জিজ্ঞাসা করিনি। বাবাঠাকুর—বাবাঠাকুর। তার নামে অত প্রয়োজন কি! হিন্দু কি মুসলমান কোনদিন জানতে চাইনি। আর চাইবোই বা কেন? ভক্তির ভগবান। তাকে ভক্তি হয়েছিল তাই বাড়িতে এনে রেখেছিলাম। আমি জানতাম সে ব্রাহ্মণ।

হুকুম। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছো—তোমাদের জাতি ধর্ম নষ্ট করতে ওই ভেক ধরেছিল। তাই বলছি—

রামু। যাক, যা ভাল বোঝ কর। সত্যিই যদি সে মুসলমান হয়ে হিন্দুর ঠাকুরদের নিয়ে এতদিন ছেলেখেলা করে থাকে, তবুও আমরা তাকে কিছুই বলব না। কারণ আমরা তাকে বাবাঠাকুর বলেই স্থান দিয়েছি।

[প্রস্থান।

হুকুম। এবার আমাকে হুকুম দিন কুমার বাহাদুর, আমি আমার কর্তব্য পালন করতে রমজানকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাই।

কানাইয়ের প্রবেশ।

কানাই। তাকে পেলে তো গ্রেপ্তার করবে।

প্রণয়। কেন?

কানাই। কেন কি? বাবাঠাকুরের ঠাকুরঘর নবাবের লোকেরা যখন ভেঙে দিচ্ছিল—তখন বাবাঠাকুরের দু'চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

প্রণয়। তারপর?

কানাই। তারপর আর কি! সেই যে ঠাকুর কাঁদতে কাঁদতে কোথায় অদৃশ্য হলো তা ঠাকুরই জানে।

প্রণয়। সেকি! চল কানাই, আমরা ছুটে যাই। যেমন করেই হোক বাবাঠাকুরকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

[প্রস্থান।

কানাই। তুমি আর দাঁড়িয়ে কেন গো? ফিরে যাও। গিয়ে হয়তো দেখবে, বাবাঠাকুর নিজেই বন্দী হয়ে নবাব সাহেবের সামনে হাজির হয়েছে!

[প্রস্থান।

হুকুম। আশ্চর্য এই হিন্দু জাতি। কিভাবে যে এই মহান শক্তিশালী জাতি দীর্ঘদিন ধরে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পায়ের তলায় নত হয়ে আছে তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সাহেব আলির বাড়ির সম্মুখভাগ

আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। কত কথা জমে আছে এই দীলের দীলবাগে। কাকে জানাবো? এই দুনিয়ায় জানার আজ আর কেউ নেই। রমজান—উঃ রমজান! আমার জীবনে কেন তুমি এভাবে উদয় হলে? এ তীব্র জ্বালা আমি যে সইতে পারছি না। আর এ পোড়া রূপ বইতেও পারি না।

সাহেব আলির প্রবেশ।

সাহেব। আলেয়া—আলেয়া! একি মা, তুই কাঁদছিস? তোর আঁখে পানি? কি হয়েছে তোর?

আলেয়া। কিছু হয়নি।

সাহেব। হয়নি বললেই হলো! বল না বেটি কি হয়েছে তোর। ও—রমজানের জন্যে দীলটা কাঁদছে বুঝি?

আলেয়া। আব্বাজান!

সাহেব। আঁখের পানি মুছে ফেল বেটি। ওরে, লাভ কি খামোকা তার জন্যে কেঁদে? সে আমাদের কে? কেউ না—কেউ না, সে আমার দুষমন।

আলেয়া। আব্বাজান!

সাহেব। তা না হলে বচপন থেকে তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। আমার দোয়ায় সে বড় হলো, তারপর হলি তুই।

আমার ভাঙা মঞ্জিলে যেন চাঁদের রোশনাই ঠিকরে পড়লো। কিন্তু সে হতভাগা এমন বেইমান হলো কি করে?

আলেয়া। কাকে কি বলছো আব্বাজান? রমজান না তোমার বেটা! খোদার কাছে তার জন্যে তুমি দোয়া প্রার্থনা করো বাপজান, তার জন্যে দোয়া প্রার্থনা করো।

কানাইয়ের প্রবেশ।

কানাই। সেকথা পরে হবে। এখন যদি তার প্রাণ বাঁচাতে চাও, তাড়াতাড়ি সুলতানের দরবারে যাও। মুসলমানের ছেলে হয়ে হিন্দুর ঠাকুরকে ভজনা করে, তাই সুলতান তাকে কোতল করবে বলে বেঁধে নিয়ে গেছে।

সাহেব। কোতল করবে কেন? আরে সে তো হিন্দুর ছেলে।

কানাই। আমাকে একথা বললে কি হবে? যদি তাকে বাঁচাতে চাও, একথা সুলতানকে গিয়ে বল।

সাহেব। সস্তার শির—অমনি নিলেই হলো! এই বুড়ো সাহেব আলি জিন্দা থাকতে তার ব্যাটা রমজানের শির নেয়—এমন মরদ বাংলা মুল্লুকে কেউ নেই। যাচ্ছি আমি, দেখাচ্ছি মজা! [আলেয়াকে] তুই তবে বেশী করে রসুই বানিয়ে রাখিস রে বেটি। আমি রমজানকে আজ জোর করে নিয়ে আসবোই আসবো।

[প্রস্থান।

কানাই। আমিও তবে যাই, দেখি গিয়ে ব্যাপারটা কি হয়!

আলেয়া। এখনই চলে যাবে? একটু বসবে না?

কানাই। আমার কি বসার সময় আছে? আমার যে অনেক কাজ।

আলেয়া। তোমার পরিচয় তো দিলে না?

কানাই। আমি তোমাদের রমজান মিঞার চাকর।

আলেয়া। চাকর?

কানাই। হ্যা। বাগানে জল ঢালি, কুঁড়েতে ঝাঁট-জল দিই, ফুল তুলি—

আলেয়া। আহা, কত কষ্ট হয় তোমার! অতটুকু ছেলে—

কানাই। দেখ, ছেলে ছেলে করো না বাপু! এতে আমার বেজায় রাগ হয়। যে দেখে—সেই আমায় ছেলে বলে। দূর-দূর, আর কখনও আসবো না তোমাদের বাড়িতে।

[প্রস্থান।

আলেয়া। বাঃ, কি মিষ্টি কথা! এমন কথা তো কখনও কারও মুখে শুনিনি। আল্লা, তোমার কাছে দীনা আলেয়ার ছোট্ট একটি আরজ—ভোগ চাই না, ত্যাগই চাই। তবে যেন রমজানের পাশে থেকে সমানে তোমার এবাদৎ করতে পারি মেহেরবান, তোমার এবাদৎ করতে পারি। [প্রস্থানোদ্যত]

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে "আল্লা-হো আকবর" রব]

বৈরাম লোদীর প্রবেশ।

বৈরাম। শোভান'ল্লা! বহুৎ খাপসুরৎ।

আলেয়া। কে?

বৈরাম। আমি দিল্লীওয়ালা। স্বয়ং দিল্লীশ্বরের পঞ্চাশহাজারী মনসবদার, নাম বৈরাম লোদী। চলে এসো বিবিজান।

আলেয়া। কোথায়?

বৈরাম। আমার ছাউনীতে।

আলেয়া। কেন? সেখানে আমি কেন যাব?

বৈরাম। আলবৎ যাবে বিবিজান। সহজে না গেলে চুলের মুঠি ধরে জোর করে নিয়ে যাব। তারপর তোমার ওই হাসিমাখা সুরতটাকে দলে-পিষে মলিনাক্ত করে ছুঁড়ে ফেলে দেবো বাংলার পচা আঁস্তাকুড়ে।

আলেয়া। দিল্লীওয়ালা!

বৈরাম। খামোশ বেসরমী! বেশী বাচালতা করলে চাবুক মেরে সহবৎ শিখিয়ে দেবো। বল আমার সঙ্গে যাবে কি না?

আলেয়া। না—না, কিছুতেই যাবো না।

বৈরাম। বৈরাম লোদীর শিকার কোনদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি পেয়ারী। আমার দীল যখন তোমায় পেতে চেয়েছে, তখন তোমাকে আমার চাই-ই—চাই।

আলেয়া। বৈরাম লোদী! একটা কথা—

বৈরাম। কি?

আলেয়া। আমায় জোর করে নিয়ে যেতে হবে না। আমি স্বেচ্ছায় যাবো তোমার সঙ্গে। কিন্তু—

বৈরাম। কোন কিন্তু নয় মেরে জানি! স্বেচ্ছায় যদি তুমি দিল্লী যেতে চাও, আমি তাঞ্জামে করে নিয়ে যাব পিয়ারী।

আলেয়া। কেন, সাদি করবে নাকি?

বৈরাম। সাদি? হাঃ-হাঃ-হাঃ! দুনিয়ায় যত রূপ সৃষ্টি হয়েছে, সব এই বৈরাম লোদীর জন্যে। ঔরাং—পুরুষের ভোগের উপদান। সাদির কথা এখানে আসতেই পারে না।

আলেয়া। বৈরাম লোদী!

বৈরাম। বৈরাম লোদী একবারের বেশী কোন জেনানাকে তার

উত্তপ্ত কলিজায় ঠাঁই দেয় না শাপি, সে যতই খাপসুরৎ হোক। চলে এসো। [ধরিতে উদ্যত]

আলেয়া। হুঁশিয়ার জানোয়ার!

বৈরাম। বড়ি তাজ্জবকি বাত! বাঙালী জেনানা হয়ে বৈরাম লোদীর মুখের ওপর এইসি বড়ি হিম্মৎকা জবান!

আলেয়া। বাংলায় এসে এতদিন কেবল মামুলি জেনানাই দেখেছ মিঞা। বোধহয় আসল জেনানার সঙ্গে তোমার মুলাকাৎ হয়নি, তাই তোমাদের এ বাড়-বৃদ্ধি। আমি এতক্ষণ তোমায় যাচাই করে দেখছিলাম কি তোমার উদ্দেশ্য। যাও, এখনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। এটা সাহসপুর। আর আমি থানাদার জালিম কাজীর বহিন।

বৈরাম। তাই নাকি? বড়ে আফশোষকি বাৎ! আমি ভেবে-ছিলাম কোই আশমানকা হুরী হোগা। তা ভালই হলো। ঢিল কুড়োতে এসে হীরে কুড়িয়ে পেলাম। এসো, আমি তোমাকে তোয়াজ করে দিল্লী নিয়ে গিয়ে আমার পেয়ারের খাস বাঁদী বানাব।

আলেয়া। কেন মিঞা, দিল্লীতে কি জেনানার মড়ক লেগেছে?

বৈরাম। নেহি মেরি জান! দিল্লীতে বহুৎ জেনানা আছে। তারা রূপের খান, কিন্তু জৌলুস নেই। তোমাদের রূপ নেই, লেকিন জৌলুস বহুৎ মজাদার।

আলেয়া। এখনও বলছি তুমি এখান থেকে যাবে কি না?

বৈরাম। যাব। তবে একা নয়, তোমাকে নিয়েই যাব। [সহসা আলেয়ার হাত ধরিল]

আলেয়া। বৈরাম লোদী!

বৈরাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আলেয়া। কে আছ? বাঁচাও—বাঁচাও—

বৈরাম। কেউ নেই—কেউ নেই পিয়ারী।

তরবারি হস্তে জালিম কাজীর প্রবেশ।

জালিম। আছে। বাংলার বাঙালীরা এখনও জীবিত আছে।

আলেয়া। ভাইজান!

জালিম। ভয় নেই বহিন।

বৈরাম। কে তুই বেয়াদব?

জালিম। বেয়াদব একজন বাঙালী মিঞাজান।

বৈরাম। কি চাস এখানে?

জালিম। চাই তোমায় কোতল করতে।

বৈরাম। তবে জাহান্নামে যা বাঁদীকা বাচ্চা!

[উভয়ের যুদ্ধ; বৈরামের পরাজয় ও পলায়ন।

আলেয়া। ভাইজান!

জালিম। বহিন! দিল্লী থেকে সম্রাট সিকিন্দার লোদীর মেহমানরা এসে তামাম বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। তারা অত্যাচারে, লুণ্ঠনে, নারী নির্যাতনে বাংলার আশমান-জমিন বিষাক্ত করে তুলেছে। এ সময় একা তোমার ঘরের বাইরে আসা মোটেই উচিত হয়নি।

আলেয়া। কিন্তু কি করবো ভাইজান! বাপজান দরবারে গেছে, রমজানকে সুলতানের লোকেরা বন্দী করেছে। এখনই তার বিচার হবে।

জালিম। বেশ, আমিও তাহলে দরবারে চললাম। বাপজান ফিরে এলে তাকে সঙ্গে করে তুমি থানায় গিয়ে উঠবে। আমি তোমার

ভাবী সাহেবার কাছে সংবাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি। বহিন, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রাখবে। বাইরে থেকে কেউ ডাকলে কিছুতেই দরজা খুলবে না, এমন কি আমি ডাকলেও না।

[প্রস্থান।

আনোয়া। বেশ, তাই হবে ভাইজান।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নবাব দরবার

বন্দী রমজান, পশ্চাতে ভাবনা কাজীর প্রবেশ।

রমজান। ঠাকুর—ঠাকুর, দাঁড়াও ঠাকুর, একটু অপেক্ষা কর। আমি তোমার সঙ্গে যাবো। কই, কোথায় গেল? এই পথেই যে ঠাকুর আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো। একি, আমি তবে কোথায় এলাম? দেখা দাও ঠাকুর, দেখা দাও।

ভাবনা। এই কমবক্ত! এখানে আবার কাফেরদের মত ঠাকুর ঠাকুর বলে চিৎকার করছিস? সাহসপুরের সাহেব আলি মোল্লা তোর কে?

রমজান। আমার বাপজান।

ভাবনা। বাপজান?

রমজান। হ্যা গো, হ্যা। আমার ঠাকুর বলে—ওই তো আমার বাপজান।

ভাবনা। বারবার ওই একই কথা, ঠাকুর—ঠাকুর! তবে জাহান্নামে যা কাফের কুত্তা! [কশাঘাত]

রমজান। উঃ ঠাকুর! এ তোমার কি ছলনা?

ভাবনা। তোমার ছলনা এবার ভুলিয়ে দিচ্ছি। [পুনরায় কশাঘাতে উদ্যত]

গোবিন্দর প্রবেশ।

গোবিন্দ। হুঁশিয়ার কাজীসাহেব!

ভাবনা। কে তুই?

গোবিন্দ। আমার নাম গোবিন্দ দাস।

ভাবনা। দরবারে কেন?

গোবিন্দ। এলাম তোমাদের দেখতে। দরবারটা তো আর তোমাদের একার নয়!

ভাবনা। হুঁশিয়ার বেয়াদব!

গোবিন্দ।—

গীত

মানুষ নিয়ে করছ খেলা এ তো ভাণ্ডার খেলা নয়।
দিনে দিনে যাচ্ছ বেড়ে এত বাড় তো ভাল নয়॥
আসছে দিন তোমার কাছে,
মিথ্যা নয়কো সত্যি বটে,
চলবে নাকো জারিজুরি হিসাব নেবে সমুদয়॥

ভাবনা। হুঁশিয়ার বেয়াদব! [গোবিন্দকে চাবুক মারিতে উদ্যত]

হোসেনের প্রবেশ।

হোসেন। দেওয়ান ভাবনা কাজী!

ভাবনা। জাঁহাপনা!

হোসেন। বড় তাজ্জব হয়ে যাই দেওয়ান সাহেব যে দরবারে কোন প্রজা এলে আমারই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা তাদের ঠিক এইভাবে চাবুক মেরে বের করে দেয়।

ভাবনা। জাঁহাপনা! এরা আমাকে বেইজ্জত করেছে।

হোসেন। ইজ্জত কাঁচের পাত্র নয় দেওয়ান সাহেব, যে সামান্য আঘাতে তা ভেঙে যাবে।

ভাবনা। জনাব!

হোসেন। বল গোবিন্দ দাস, দরবারে তোমার কি প্রয়োজন?

গোবিন্দ। একটা ঝড় উঠবে জাঁহাপনা। ওই দেখুন বাংলার পূর্বাকাশ কেমন মেঘে ঢেকে এসেছে। তৈরী থাকুন বঙ্গেশ্বর সে ঝড়কে স্বাগত জানাতে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [প্রস্থানোদ্যত]

হোসেন। গোবিন্দ দাস! একদিন তোমার কাছে যে উপকার পেয়েছি, তা আমি জীবন থাকতে ভুলব না। যেদিন প্রথম আফগানিস্থান ত্যাগ করে এসেছিলাম এই বাংলায়, সেদিন তুমিই আমার হাত ধরে হিন্দুরাজা রামচন্দ্র রায়ের আশ্রয়ে আমায় পৌছে দিয়েছিলে। আজ নসীবের জোরে আমি বাংলার নবাব, আমার কাছে তোমার কিছু চাওয়ার নেই?

গোবিন্দ। চাইব হজরৎ! তবে আজ নয়, যেদিন ঝড়ের তাণ্ডব নর্তনে বাংলাদেশটা তোলপাড় হবে, সেদিন সেই ঝড়ের গতিরোধ করতে চাইব মাত্র একখানা হাতিয়ার। সেলাম—সেলাম।

[প্রস্থান।

হোসেন। এরাই বাংলার সুলতানের প্রকৃত বান্ধব।

ভাবনা। জাঁহাপনা! এই সেই বেয়াদব রমজান মিঞা, যে পবিত্র ইসলাম ধর্মের অবমাননা করে, হিন্দু কাফেরদের ঠাকুরের নাম-গান করে।

হোসেন। কি নাম তোমার?

রমজান। রমজান।

হোসেন। তুমি তো যশোহরে ছিলে। এখানে এলে কি করে?

রমজান। তা তো জানি না। আমার ঠাকুর আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো।

হোসেন। তোমার ঠাকুর? কই, কোথায় তোমার ঠাকুর?

রমজান। এই তো ছিল, কোথায় গেল তা তো জানি না!

ভাবনা। চোপরাও কমবক্ত! জাঁহাপনার সামনে মিথ্যা বলতে তোমার সাহস হয়?

রমজান। মিথ্যা?

হোসেন। আলবৎ! যদি সত্যি বলে থাক তাহলে তুমি তোমার ঠাকুরকে দেখাতে পারবে?

রমজান। আমার ঠাকুর যদি দয়া করে দেখা দেন, তবেই দেখাতে পারবো। নইলে কি তার দেখা পাওয়া সহজ?

হোসেন। তোমাকে ওই কাফেরদের ঠাকুরের নাম ভুলে যেতে হবে।

রমজান। তা আমি কোনদিনই পারবো না।

হোসেন। তাহলে তোমাকে মরতে হবে বেয়াদব।

রমজান। ঠাকুরের ইচ্ছা হলে মরবো, নইলে আমার মৃত্যু কেউ ঘটাতে পারবে না।

ভাবনা। জাঁহাপনা! আপনি আমাকে হুকুম দিন, আমি এই বেয়াদবকে খতম করি। [তরবারি নিষ্কাসন]

রমজান। হরিবোল—হরিবোল!

সাহেব আলির প্রবেশ।

সাহেব। জাঁহাপনা! রক্ষা করুন জাঁহাপনা, রক্ষা করুন।

হোসেন। একি সাহেব আলি মোল্লা! হঠাৎ তুমি এখানে কেন?

সাহেব। রমজানকে কোতল করবেন না খোদাবন্দ! ও মুসলমান নয়, হিন্দুর সন্তান।

সকলে। হিন্দুর সন্তান?

সাহেব। জী হজরত। আজ থেকে বহুদিন আগে এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে আনন্দদেব শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ আর তার আসন্ন-প্রসবা বিবি এসে উঠলো আমার ভাঙা মঞ্জিলে।

ভাবনা। তারপর?

সাহেব। কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুরের বিবি একটা বাচ্চা প্রসব করেই দুনিয়া ছাড়লো। পানি তখনই একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। আশমানে উঠেছে রমজানের চাঁদ। সেদিন ছিল রামনবমী তিথি। আনন্দ ঠাকুর ছেলের নাম রাখলো রামানন্দ। ভোর হতে না হতেই আনন্দ ঠাকুরের হলো ওলাউঠা। বাস, সবের না হতেই সেও ওপারে চলে গেল। তখন গ্রামের হিন্দুভাইদের ডেকে তাদের দুজনকেই একসঙ্গে সৎকার করে এলাম।

হোসেন। তারপর?

সাহেব। কোন হিন্দু যখন সন্ত মা-বাপখেকো বাচ্চাটাকে নিতে একান্তই রাজী হলো না, তখন বাচ্চাটাকে তুলে দিলাম আমার বিবির

কোলে। নাম রাখলাম জান মহম্মদ। পরে আমারও একটি বেটি হলো, তার নাম রাখলাম আলেয়া। রামানন্দ আর জান মহম্মদ দুইয়ে মিলিয়ে আমার বিবি তখন ওর নাম রাখলো রমজান।

হোসেন। ধন্য—ধন্য তুমি সাহেব আলি! সেদিন যদি তুমি পুত্রস্নেহে ওকে পালন না করতে, তাহলে বাংলার আকাশ থেকে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অকালে ঝরে যেত। তাই তারই পুরস্কারস্বরূপ আমি তোমায় দিলাম এই সামান্য উপহার। [রত্নহার প্রদান]

ভাবনা। জাঁহাপনা! সামান্য এক দীন চাষাকে দিলেন মহামূল্য রত্নহার?

হোসেন। চাষা বলেই এ রত্নহার দিলাম। দেওয়ান হলে অবশ্যই দিতাম না।

ভাবনা। জাঁহাপনা—

হোসেন। দেওয়ান ভাবনা কাজী! সাচ্চা ইসলামী বলে আমার একটা গর্ব ছিল; কিন্তু আজ দেখছি আমার থেকেও বড় ইসলামী এই সাহেব আলি।

সাহেব। জনাব! দীন বান্দাকে অপরাধী করবেন না।

হোসেন। যাও সাহেব আলি মোল্লা! সানন্দে তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আর যাবার সময় নিয়ে যাও, হতভাগ্য সুলতানের সশ্রদ্ধ সেলাম। [উভয়ের সেলাম বিনিময়]

সাহেব। জাঁহাপনা! তাহলে আমার বেটা রমজান—

হোসেন। আজ থেকে ও আর রমজান নয়, ওর নাম ঠাকুর রামানন্দ স্বামী।

রমজান। আমি ঠাকুর রামানন্দ? বাঃ-বাঃ! কি মজা—কি মজা!

সাহেব। রমজান! তুই বাড়ি চল ব্যাটা।

রমজান। যাব—বাড়ি যাব বাপজান! তবে আজ নয়, যেদিন আমার ঠাকুর আমাকে নিয়ে যাবে, সেদিন।

সাহেব। বেশ তাই যাস। আমি তবে আসি জাঁহাপনা! সেলাম—সেলাম।

[প্রস্থান।

রমজান। আমি রামানন্দ? কি মজা—কি মজা! আমি তবে আজ থেকে প্রাণ খুলে আমার ঠাকুরকে ডাকবো। হরিবোল—হরিবোল—[প্রস্থানোদ্যত]

হোসেন। কোথায় যাচ্ছো ঠাকুর?

রমজান। তা কি জানি! আমার ঠাকুর আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন, সেখানেই যাব।

হোসেন। ঠাকুর! আমি যদি তোমায় কিছু দিই, তা কি তুমি মেহেরবানী করে নেবে?

ভাবনা। ওকে আবার কি দেবেন জনাব? অর্থ অলঙ্কার জায়গীর?

হোসেন। না। দেবো মাত্র দু' বিঘা জমিন। সেই দু' বিঘা জমিনের ওপর এই গৌড়ের বুকে মুসলিম ভাইদের জন্যে তৈয়ার করবো একদিকে সোনার মসজিদ, আর একদিকে হিন্দু ভাইদের জন্য গড়ে তুলবো হরিমন্দির। সেই মন্দির-মসজিদের মাঝখানে থাকবে ঠাকুর রামানন্দ স্বামীর আশ্রম।

রমজান। হ্যাঁ-হ্যাঁ, খুব ভাল হবে। ভারি মজা হবে। হিন্দুর মন্দিরে বাজবে কাঁসর-ঘণ্টা, মুসলমানের মসজিদে উঠবে আজান ধ্বনি। [illegible] সলমানের মিলন তীর্থের মধ্যস্থলে এই হতভাগ্য দাঁড়িয়ে হিন্দুর

মন্দিরে জানাবে প্রণাম আর মুসলমানের মসজিদে জানাবে সেলাম—সেলাম।

[প্রস্থান।

ভাবনা। জাঁহাপনা! বাংলার মানুষ মুসলমান রমজানকে ঠাকুর রামানন্দ স্বামী বলে মানবে তো?

হোসেন। যার প্রাণ চাইবে—মানবে। যাক, শোন দেওয়ান ভাবনা কাজী! এই মুহূর্তে আমার প্রাসাদের অনতিদূরে সেই দু' বিঘা জমিনের ওপর একটি মন্দির আর একটি মসজিদ তৈয়ারের অয়োজন কর। আর এ ভার আমি তোমার ওপরই অর্পণ করলাম।

ভাবনা। বহুৎ আচ্ছা মেহেরবান! আপনার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে এখনই দশ হাজার কুলী নিয়ে আমি চললাম।

[প্রস্থান।

হোসেন। খোদা! আজব তোমার দুনিয়া—তাজ্জব তোমার খেয়াল।

জালিম কাজীর প্রবেশ।

জালিম। বন্দেগী হুজরৎ!

হোসেন। একি, থানাদার জালিম কাজী? কি সংবাদ বল।

জালিম। জাঁহাপনা! দিল্লীর সম্রাট সিকিন্দার লোদীর প্রেরিত অসংখ্য মেহমান এসে বাংলার বুকে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

হোসেন। সেকি!

জালিম। বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা! তারা পূর্বাঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করে বাংলার বহু ক্ষতি করেছে। লুণ্ঠনে অত্যাচারে—এমন কি নারী নির্যাতনে তারা বাংলাকে তোলপাড় করে তুলেছে।

পুরন্দর খাঁর প্রবেশ।

পুরন্দর। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

জালিম। উজির সাহেব!

পুরন্দর। জাঁহাপনা, এইমাত্র আমি দিল্লী থেকে সম্রাট সিকিন্দার লোদীর ফরমান নিয়ে আসছি। দিল্লীর সম্রাট আপনাকে বন্ধুরূপে পেতে চান। শুধু তাই নয়, জৌনপুরের সুলতান হুসেন শার সারকী রাজ্য তিনি পুনর্মুক্ত করে দিয়েছেন। এই দেখুন তাঁর দস্তখৎ। [ফরমান প্রদান]

জালিম। গোস্তাকি মাফ করবেন বঙ্গেশ্বর! আমার মনে হয় এ দস্তখৎ জাল।

হোসেন। কিন্তু দিল্লীশ্বরের সীলমোহর—

জালিম। ঝুট।

পুরন্দর। জালিম কাজী!

জালিম। তা যদি না হবে, তাঁর পঞ্চাশ হাজারী মনসবদার নিজে এসে বাংলার ওপর অত্যাচার আরম্ভ করবে কেন?

হোসেন। প্রমাণ দিতে পার?

জালিম। আলবৎ! কই হায়, বন্দী বৈরাম লোদী—

বন্দী বৈরাম লোদীকে রক্ষী রাখিয়া গেল।

জালিম। জাঁহাপনাকে সেলাম জানাও।

পুরন্দর। একি, মনসবদার বৈরাম লোদী! আপনি—

হোসেন। শৃঙ্খলমুক্ত করে দাও জালিম কাজী।

জালিম। [বৈরামের শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া] জাঁহাপনা!

হোসেন। হাজার হোক, দিল্লীশ্বর সিকিন্দার লোদী আমার দোস্ত। বৈরাম লোদী শুধু তার মনসবদারই নয়, ভাইও বটে।

জালিম। কিন্তু বৈরাম লোদী যে অপরাধ করেছে—

হোসেন অপরাধী হলেও, বৈরাম লোদী আমার ভ্রাতৃস্থানীয়— অল্পবয়স্ক। তাই খেয়ালের বশে যদি কিছু বাচালতা করেই থাকে, প্রথম অপরাধ হিসাবে আমি সমগ্র বাঙালীর কাছে ওর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।

জালিম। জাঁহাপনা—

বৈরাম। বঙ্গেশ্বর! আপনি এত মহৎ?

হোসেন। এ আমার মহত্ব নয় ভাইজান, দোস্তের প্রতি এ আমার কর্তব্য।

বৈরাম। কিন্তু—

হোসেন। জানি, রাজনীতিতে ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজনের স্থান নেই। তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, কেবলমাত্র তুমি আমার দোস্তের ভাইজান বলে।

বৈরাম। তবু আমি যে বাংলার ওপর—

হোসেন। আজ শক্তির অহঙ্কারেই হোক কিংবা কারও প্ররোচনাতেই হোক, তুমি বাংলা ধ্বংস করতে তৎপর। কিন্তু যখনই বুঝতে পারবে বাংলা তোমার—ভারতও তোমার, তখনই এদেশের একটা তুচ্ছ তৃণ পর্যন্ত তুমি বিনষ্ট করতে পারবে না।

বৈরাম। বাংলা আমার, ভারতও আমার?

হোসেন। আলবৎ। বিগত সম্রাট বহলুল লোদীর পুত্র হিসাবে দিল্লীর মসনদে তোমার অর্ধেক অধিকার। আজ যদি সিকিন্দার লোদী ভারতের সম্রাট না হয়ে তুমি হতে, তাহলে তোমার চোখের সামনে

ভেসে উঠতো সমগ্র ভারতের জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার প্রজাদের প্রতিচ্ছবি! ভেসে উঠতো দুঃস্থ বাংলামায়ের করুণ রূপ।

বৈরাম। বাংলার করুণ রূপ?

হোসেন। হ্যাঁ। কারণ বাংলা তো ভারতের বাইরে নয় ভাইজান। অবশ্য তুমিও যদি সম্রাট হতে, তুমিও চাইতে যে-কোন উপায়েই হোক তোমার অংশীদারকে ধ্বংসের আবর্তে নামিয়ে দিতে।

বৈরাম। সত্যিই তাই। জাঁহাপনা! এই দেখুন দিল্লীশ্বর সিকিন্দার লোদীর স্বাক্ষরিত হুকুমনামা। আমি নিজের ইচ্ছায় বাংলা লুণ্ঠন করতে আসিনি।

হোসেন। তাও আমি জানি। যাও পুরন্দর খাঁ, ভাইজানের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

বৈরাম। বঙ্গেশ্বর!

হোসেন। জানো বৈরাম, এর নাম জটিল রাজনীতি। সব সময় একটা কথা মনে রেখো, তুমি দিল্লীশ্বরের বৈমাত্রেয় ভাই।

বৈরাম। ঠিক—ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা, আমি ভারতসম্রাটের বৈমাত্রেয় ভাই। তাই সে চায় আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে মসনদ নিষ্কণ্টক করতে।

হোসেন। কারণ তিনি জানেন, বাংলার শক্তি দিল্লীর থেকে কোন অংশে কম নয়। শুধু দিল্লী কেন, বাংলা আজ যে-কোন শক্তিরই গতিরোধ করতে সক্ষম।

বৈরাম। আজ আসি বঙ্গেশ্বর! আমার কৃতকর্মের জন্যে আপনি আমায় ক্ষমা করুন। এই মুহূর্তে আমি যাব দিল্লীতে। ভারতসম্রাট সিকিন্দার লোদীকে বুঝিয়ে দেবো যে আমিও বহলুল লোদীর পুত্র লোদী বৈরাম-এ-আলম। [কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।

জালিম। জাঁহাপনা!

হোসেন। সম্রাট সিকিন্দার লোদী! তুমি বাংলায় এক হিংস্র শার্দুল পাঠিয়েছ। কিন্তু জান না, এই আলাউদ্দিন হোসেন শাহ হিংস্র শার্দুলকে বশীভূত করতে জানে! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

জালিম। জনাব!

হোসেন। জালিম কাজী! যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তাই বাংলার সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখতে সর্বতোভাবে তৈয়ার থাক।

জালিম। তাই হবে জাঁহাপনা। বাংলার মান-সম্ভ্রম বজায় রাখতে আমরা মৃত্যু দিয়ে লিখে রেখে যাব বীর বাঙালীর নাম। বাংলা-মাকে রক্ষা করতে তার অসংখ্য দামাল ছেলের হাতে মুক্তির হাতিয়ার তুলে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলবো—প্রয়োজনে আমরা প্রাণ দেবো, তবু বিদেশী শক্তির কাছে মান দেবো না।

[প্রস্থান।

হোসেন খোদা যেন তোমার মনের আশা পূরণ করেন।

পুরন্দর। জাঁহাপনা! দিল্লীশ্বর সিকিন্দার লোদী এত কূট-কৌশলী?

রহমৎ খাঁর প্রবেশ।

রহমৎ। বঙ্গেশ্বরের জয় হোক।

পুরন্দর। একি, ভারতসম্রাটের সিপাহশালার রহমৎ খাঁ!

হোসেন। সহসা দিল্লী পরিত্যাগ করে সিপাহশালারের বাংলায় কি প্রয়োজন?

রহমৎ। আমি দিল্লীশ্বরের জরুরী পত্র নিয়ে এসেছি।

হোসেন। হঠাৎ?

রহমৎ। দিল্লীশ্বর আপনার পত্র পেয়ে জৌনপুরের হুসেন শাহের

রাজা স্বেচ্ছায় পুনর্মুক্তি করায়, সম্রাটের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বৈরাম লোদী অসন্তুষ্ট। শুধু তাই নয়, তিনি মনসবদারীতে ইস্তফা দিয়ে সক্রোধে দিল্লী পরিত্যাগ করেছেন। তাই শাহেনশার অনুমান, হয়তো তিনি হঠাৎ বাংলা আক্রমণ বা বাংলার ওপর অন্যায় অত্যাচার করতে পারেন।

হোসেন। তাই নাকি ? তাহলে তো বড় চিন্তার কথা পুরন্দর খাঁ।

পুরন্দর। এখন কি উপায় হবে হজরৎ ?

রহমৎ। উপায় তো শাহেনশাই স্থির করে দিয়েছেন।

পুরন্দর। কি ?

রহমৎ। যদি সত্যিই বৈরাম লোদী এ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে তাকে যেন বন্দী করে দিল্লীতে চালান দেওয়া হয়। আর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন হলে তাকে যেন এই বাংলার মাটিতেই কবর দেওয়া হয়। এই দেখুন দিল্লীশ্বরের আদেশপত্র। [আদেশপত্র হোসেনকে দিল]

হোসেন। [পত্র পাঠান্তে] হুঁ পুরন্দর খাঁ! এই দেখ, ভারত-সম্রাট সিকিন্দার লোদীর হুকুমনামা। [পুরন্দরকে দিল]

রহমৎ। ভারতসম্রাটের হুকুমনামা ?

হোসেন। হ্যাঁ সিপাহশালার। [পুরন্দর খাঁ হুকুমনামা রহমতকে দেখাইল] ভাল করে দেখুন সিপাহশালার। ভারতসম্রাটের সীলমোহর জাল নয় তো ?

রহমৎ। আশ্চর্য !

পুরন্দর। কি হলো সিপাহশালার ? এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, রাজনীতির হীন ষড়যন্ত্রের মধ্যে আপনাকে সুকৌশলে জড়িয়ে ফেলাই হচ্ছে ভারতসম্রাটের একমাত্র উদ্দেশ্য।

রহমৎ। বঙ্গেশ্বর! আমি অপরাধী। আপনার বিচারে আমার যে শাস্তি প্রাপ্য হয়, মেহেরবানী করে তাই দিন।

হোসেন। তোমাকে শাস্তি দিয়ে আমি বাংলামায়ের অপমান করতে পারি না রহমৎ খাঁ। কারণ হাজার অপরাধী হলেও, তুমি বাঙালী। তাই স্বচ্ছন্দে আমি তোমায় বিদায় দিলাম।

রহমৎ। বঙ্গেশ্বর!

হোসেন। যাও ভাই, এই মুহূর্ত তুমি দিল্লী রওনা হও। গিয়ে বলো তোমার সম্রাটকে, যেন যুদ্ধের জন্যেই প্রস্তুত থাকে। আর এ কথাও জানিয়ে দিও, বাঙালী বড় শান্তিপ্রিয় জাতি। আগে আঘাত না করলে তারা প্রত্যাঘাত করে না। শুধু দিল্লী কেন, যে-কোন শক্তির গতিরোধ চিরকাল এই বাংলাদেশ করে আসছে, আর আজও সে শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে।

রহমৎ। তাই বলবো বঙ্গেশ্বর! ভারতসম্রাটের এই চক্রান্ত যদি সত্যি হয় তাহলে জাহান্নামে যাক পদমর্যাদা। এই মুহূর্তে সম্রাটের দেওয়া নোকরীতে ইস্তফা দিয়ে বাঙালী রহমৎ খাঁ আবার বাংলায় ফিরে আসবে। গরীব চাষীর ছেলে আমি। রুটি না জোটে, লাঙলের মুঠি ধরে হলকর্ষণ করে জিন্দেগী কাটাব, তবু ইমানের মাথায় পয়জার মেরে আমি ইমারৎ বানাতে চাই না।

[প্রস্থান।

হোসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সম্রাট সিকিন্দার লোদী! তুমি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নামই শুনেছ, পাওনি তার আসল পরিচয়।

পুরন্দর। জাঁহাপনা!

হোসেন। পুরন্দর খাঁ! আগ্নেয়গিরি যেমন তার উত্তপ্ত লাভায় চারদিক নিশ্চিহ্ন করে দেয়, ঠিক সেইভাবে সম্রাট সিকিন্দার লোদীর

অসম্ভ লাভায় আমি তাকেই পুড়িয়ে মারতে চাই। যাও পুরন্দর খাঁ, তুমি পরিশ্রান্ত—বিশ্রাম করগে।

পুরন্দর। খোদা আপনার সহায় হোন।

[প্রস্থান।

হোসেন। সিকিন্দার লোদী—সিকিন্দার লোদী। এইবার তোমার সঙ্গে হবে আমার পহেলা মুলাকাৎ। [প্রস্থানোদ্যত]

হুকুম আলি সহ বন্দী রামুঠাকুরের প্রবেশ।

হুকুম। বান্দার হাজার সেলাম পৌছে জাঁহাপনা!

হোসেন। কে এই বন্দী?

হুকুম। যশোহর পরগণার এক দীন ব্রাহ্মণ।

হোসেন। [রামুর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া] কি নাম তোমার?

রামু। রামপ্রসাদ গোস্বামী।

হোসেন। তুমি রাজা প্রতাপ রায়ের প্রজা?

রামু। হ্যাঁ জাঁহাপনা!

হোসেন। আমি সংবাদ পেয়েছি, তুমিই রমজান মিঞাকে গ্রেপ্তার করতে বাধা দিয়েছ। এমন কি তার পালাবার সুযোগও করে দিয়েছ। এখন বল, রমজান কোথায়?

রামু। কেমন করে জানবো বঙ্গেশ্বর? সামান্য এক পত্র লিখে রেখে সে যশোহর পরগণা ছেড়ে চলে গেছে।

হোসেন। কই দেখি, কি লেখা আছে পত্রে?

রামু। [নামাবলীর কোণ হইতে পত্র দিতে গিয়া সবিস্ময়ে] জনাব!

হোসেন। কি হলো?

রামু। পত্র নেই জনাব! পরিবর্তে রয়েছে ফুল আর তুলসীপত্র। [ফেলিয়া দিল]

হোসেন। করলে কি—করলে কি ব্রাহ্মণ? যার পত্র এত সহজে ফুল-তুলসীতে পরিণত হয়, তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে তা অনায়াসে মাটিতে ফেলে দিলে?

রামু। জাঁহাপনা!

হোসেন। আমি মুসলমান, হিন্দুর ঠাকুর মানি না। তাই বলে তুমি তা করবে কেন?

রামু। আমার কাছে ওই ফুল-তুলসী—

হোসেন। অতি ভক্তির বস্তু। কারণ আমার কাছে যে মাটির পুতুল, তোমার কাছে সে দেবতা আমি যাকে এনকার করি, তুমি তাকে ভক্তি করতে ভুলবে কেন? দাও ব্রাহ্মণ, ওই ফুল-তুলসী এই হতভাগ্য স্থলতানের মাথায় দাও।

সকলে। জাঁহাপনা!

হোসেন। তোমরা যাকে পায়ে মাড়াতে চাও, আমি তাকে মাথায় তুলে নিলাম। [মাটি হইতে ফুল-তুলসী তুলিয়া মাথায় লইল] হ্যাঁ, বল হুকুম আলি! রমজানকে গ্রেপ্তার করতে না পেরে তোমরা কখন যশোহর থেকে রওনা হয়েছ?

হুকুম। রমজান নিরুদ্দেশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই, আমরা এই রামু ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করি। বিশবাহকী নৌবহরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নাবিকরা এইমাত্র ঘাটে বজরা ভিড়িয়েছে মালিক।

হোসেন। যদি বলি, রমজান মিঞা তার আগেই দরবারে হাজির হয়েছিল, বিচারও তার হয়ে গেছে?

হুকুম। সে কি করে সম্ভব জাঁহাপনা?

হোসেন। হুকুম আলি খাঁ! চেয়ে দেখ, ওই গাছের তলায় সাধনায় রত কে?

হুকুম। ওকি! ওই তো রমজান মিঞা। আমি এখনই যাচ্ছি জাঁহাপনা! ওই বেয়াদবকে—[প্রস্থানোদ্যত]

হোসেন। হুঁশিয়ার হুকুম আলি! এক পাও এগোবার চেষ্টা করো না। আমার আদেশ, যে ওর দেহে কাঁটার আঁচড় দেবে, কিংবা সাধনায় বাধা দেবে, আমি তাকে দেবো জীবন্ত কবর।

হুকুম। জাঁহাপনা—

হোসেন। আরও শোন। ওর জন্ম-পরিচয় পাওয়া গেছে। ও হিন্দু ব্রাহ্মণ-সন্তান। ওর নাম রামানন্দ স্বামী.

রামু। [সবিস্ময়ে] জাঁহাপনা!

হোসেন। ব্রাহ্মণ! তোমার সাহস ও বীরত্বকে জিন্দাবাদ জানাই। তোমাকে যদি আমি নোকরী দিই?

রামু। আপনার দান আমি মাথায় তুলে নেবো জাঁহাপনা।

হোসেন। হুকুম আলি! রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করে দাও, আজ থেকে এই ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদ গোস্বামী আমার পঞ্চত্রিশ হাজারী ফৌজদার।

হুকুম। তাহলে আমিই সর্বপ্রথম ফৌজদার সাহেবকে জানাই আমার শ্রদ্ধার সেলাম।

রামু। মহানুভব বঙ্গেশ্বর! আপনার এই বিচার-বুদ্ধি যেন যুগ যুগ ধরে ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখেন। সেলাম জাঁহাপনা, সেলাম।

[প্রস্থান।

হোসেন। তুমি কিছু বলছ না যে হুকুম আলি?

হুকুম। কি আর বলবো হজরৎ ?

হোসেন। তুমি কিছু চাইবে না ?

হুকুম। আমার তো কিছু অভাব নেই বঙ্গেশ্বর। আপনার কাছে যা বেতন পাই তাতেই আমার চলে যায়। তাই আমার আশা বা নেশা—দুটোর কোনটাই নেই।

হোসেন। আমি জানি হুকুম আলি, কি খনি লুকিয়ে আছে তোমার অন্তরে। তোমার স্থান সাধারণ মানুষের মাপকাঠির বাইরে।

হুকুম। হজরৎ !

হোসেন। একটা ভীষণ ঝড় উঠবে হুকুম আলি, ভীষণ ঝড়।

হুকুম। সে ঝড়ের গতিরোধ করার শক্তি কি আমাদের নেই জাঁহাপনা ?

হোসেন। আছে। কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে আজ দুষমনের আড্ডাখানা! যাক সেকথা। তোমাকে আবার ছুটতে হবে আমার ফরমান নিয়ে। বাংলার যেখানে যত রাজা-জমিদার, তালুকদার-জায়গীরদার আছে, তাদের শোনাতে হবে আসন্ন যুদ্ধের কথা। বলতে হবে, বাংলা-মাকে রক্ষার জন্যে সবাই যেন প্রস্তুত থাকে। আর বহিন বিজলীবাঈ যাবে দিল্লীতে গুপ্তচর হয়ে। এইবার দেখব সিকিন্দার লোদী, বুদ্ধির যুদ্ধে জয়ী হয় কে ? তুমি, না আমি ?   [প্রস্থান।

হুকুম। বঙ্গেশ্বর! সবাই জানে আমি আপনার বিশতঙ্কা বেতনের গোলাম। কিন্তু আপনি আমাকে ভাবেন বাংলার মাটিতে কুড়িয়ে পাওয়া। আমি আপনার ছোট ভাইজান। তাইতো আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁদি, আর দীন দুনিয়ার মালিক মেহেরবান খোদাকে ডেকে বলি—আমার সুলতানের তুমি মঙ্গল কর খোদা, মঙ্গল কর!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

দিল্লীর প্রাসাদ

সিকিন্দারের প্রবেশ।

সিকিন্দার। [আসনে রক্ষিত মদ্যপাত্র লইয়া পান করিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ! দুনিয়ামে সবসে সেরা চিজ হ্যায় সাকি আউর সরাপ, মৌজ আউর খোয়াব। ঠিক এমনি করে আমি আমার সাম্রাজ্য চালিয়ে যাব।

বিজলীবাঈয়ের প্রবেশ।

বিজলী। জাঁহাপনা—

সিকিন্দার। কে?

বিজলী। দিল্লীর ভূতপূর্ব উজির কুদ্দুস মহম্মদের কন্যা। নাম জহরৎ।

সিকিন্দার। সত্যিই তুমি জহরৎ। তোমার রূপের রোশনী যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তোমার সুরৎ দেখে মনে হয়, যেন বেহেস্তের স্ত্রী। চোখে তোমার মৌতের ইঙ্গিত, দীলে রয়েছে বেহেস্তের খোয়াব, কণ্ঠে এক নতুন সুর। বল জহরৎ, কি তোমার প্রয়োজন?

বিজলী। আমি শাহজাদা বৈরাম লোদীর সন্ধানে এসেছি। শাহজাদা আমাকে কথা দিয়েছিল বেগম করবে। কিন্তু লোকমুখে শুনলাম তিনি নাকি রাজকার্য নিয়ে বাংলায় গিয়েছিল আর বাংলার অপদার্থ সুলতান তাকে কোতল করেছে। এমনি আমার বদনসীব! এখন আমার কি হবে জাঁহাপনা?

সিকিন্দার। কেঁদো না জহরৎ। আমি তো রয়েছি। শাহজাদার বেগম হওয়ার চেয়ে আমি যদি তোমাকে ভারত-সম্রাজ্ঞী করি?

বিজলী। আমার নসীবে কি তা হবে হজরৎ?

সিকিন্দার। আলবৎ হবে। তুমি রূপের খনি। একমাত্র ভারত-সম্রাজ্ঞী হওয়ার জন্তেই খোদা তোমায় সৃষ্টি করেছেন।

বিজলী। কিন্তু শাহজাদা যদি ফিরে আসে?

সিকিন্দার। কোনদিন সে আর ফিরবে না। ফিরতে চাইলেও আমি তাকে ফিরতে দেবো না। এবার আমি বাংলা আক্রমণ করবো। যদি বৈরাম একান্তই জীবিত অবস্থায় ফিরে আসে, তবে সেই এ যুদ্ধের সৈন্য পরিচালনা করবে। আমি তোমাকে কথা দিলাম, তুমিই হবে ভারত-সম্রাজ্ঞী।

বিজলী। বাঁদীর হাজার হাজার সেলাম নিন।

সিকিন্দার। একবার কাছে এসো পিয়ারী।

বিজলী। এখন নয় জাঁহাপনা। আসব আপনার কক্ষে নিশীথের অন্ধকারে। সেলাম।

[প্রস্থান।

সিকিন্দার। বহুৎ আচ্ছা! সাবাস দুনিয়াদার! চমৎকার নসীব সৃষ্টি করেছ আমার। বৈরাম লোদীর বাগদত্তা আলমনের হুরী জহরৎ বিবি হবে আমার বেগম। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ক্রোধান্বিত বৈরামের প্রবেশ।

বৈরাম। কই, কোথায় সম্রাট সিকিন্দার লোদী?

সিকিন্দার। একি বৈরাম! তোমাকে এত উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন?

বৈরাম। উত্তেজিত করেছ তুমি।

সিকিন্দার। বৈরাম!

বৈরাম। তুমি চাও আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিল্লীর সিংহাসন নিষ্কণ্টক করতে। তাই দোস্তির সন্ধিপত্র পাঠিয়ে আবার আমাকে পাঠিয়েছ বাংলার ওপর অত্যাচার করতে।

সিকিন্দার। বৈরাম! তুমি স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন তা জানতাম, কিন্তু বুদ্ধিহীন বলে জানতাম না।

বৈরাম। তার অর্থ?

সিকিন্দার। আমরা আক্রমণকারী। যেমন করেই হোক বাংলা আমার চাই-ই। তুমি এমনি নির্বোধ যে আমার খোয়াবে ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছ। আমার নসীবকে তুমি টুকরো টুকরো করে বাংলার পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছ?

বৈরাম। কি বলছ তুমি ভাইসাহেব?

সিকিন্দার। বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের কাছে বন্দী হয়েছিলে বোধহয়?

বৈরাম। আমার এক অসতর্ক মুহূর্তে—

সিকিন্দার। তোবা—তোবা! সামান্য এক বাংলার সুলতান তোমাকে মেহেরবানী করে মুক্তি দিয়ে তার শয়তানি যুক্তি তোমার মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে আমাদের ঘরে ঘরে বিবাদ লাগাবার জন্যে। আর তুমি আমার ভাইজান, অথচ এমনই নির্বোধ যে, তার কথায় তোমার কর্তব্যই ভুলে গেলে।

বৈরাম। ভাইসাহেব!

সিকিন্দার। শোন। রহমৎ খাঁ সিপাহ্‌শালার হলেও সে বাঙালী, তাই বাংলার ওপর তার দরদ অনেক। সহজে সে বাংলা আক্রমণ

করতে চাইবে না। তাইতো আমি গোপনে তোমাকে পাঠালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার পদত্যাগ ঘোষণা করে রহমৎ খাঁকে পাঠালাম বাংলার সুলতানের কাছে।

বৈরাম। রহমৎ খাঁকে?

সিকিন্দার। যদি সে বাংলায় গিয়ে দিল্লীর সিপাহশালারের পদ-মর্যাদা আশা করে, তাহলে বাংলার সুলতান তাকে করবে অপমানিত। তখন দেখবে ভাইজান, রহমৎ খাঁও বাংলার ধ্বংস কামনা করছে। এ হলো জটিল রাজনীতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বৈরাম। কিন্তু—

সিকিন্দার। কোন কিন্তু নেই। বাংলার সঙ্গে যুদ্ধ হবেই। এবার তুমি বসবে দিল্লীর মসনদে, আর আমি যাব বাংলায়।

ক্রোধান্বিত রহমতের প্রবেশ।

রহমৎ। এ প্রহসনের কারণ কি শাহেনশাহ?

সিকিন্দার। তুমি বুঝতে পারছ না সিপাহশালার যে রাজনীতির সুড়ঙ্গ পথ বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলে।

রহমৎ। আমাকে নতুন করে বোঝাতে চাইবেন না। আগে কেন আমায় মেহেরবানী করে বললেন না যে, বৈরাম লোদীকে আপনি নিজেই বাংলা ধ্বংস করতে পাঠিয়েছেন?

বৈরাম। তুমি কি দিল্লীশ্বরকে চোখ রাঙাতে চাও?

রহমৎ। আমার কথা আমার প্রভুর সঙ্গে, তার গোলামের সঙ্গে নয়।

বৈরাম। রহমৎ খাঁ! [অসি নিষ্কাসন]

সিকিন্দার। আঃ, বৈরাম লোদী! এটা রণস্থল নয়।

বৈরাম। আমার গোস্তাকি মাফ কর ভাই সাহেব। আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম।

সিকিন্দার। শোন রহমৎ! যে বাংলার বাঙালীরা তোমাকে জালিয়াত প্রতিপন্ন করেছে, তাদের শিক্ষা দিতে তুমিই যাবে এ যুদ্ধের নেতৃত্ব নিয়ে।

রহমৎ। আমায় ক্ষমা করবেন জনাব। আমি নোকরিতে ইস্তফা দিলাম। এই নিন আপনার দেওয়া হাতিয়ার। [পায়ের কাছে তরবারি রাখিল]

সিকিন্দার। কিন্তু আসন্ন যুদ্ধের সময় আমি তো তোমায় ত্যাগ করতে পারি না।

রহমৎ। আমিই আপনাকে ত্যাগ করছি।

বৈরাম। আমরা তোমাকে বন্দী করে রাখব।

রহমৎ। রহমৎ খাঁর পরিচয় বহুবারই পেয়েছ বৈরাম লোদী। মৃত্যুর আগে আমাকে বন্দী করা অসম্ভব। [অস্ত্রধারণে উদ্যত]

সিকিন্দার। খবরদার! পদত্যাগ করার পর অস্ত্রধারণ নীতি-বিরুদ্ধ। বৈরাম! বন্দী কর এই শয়তানকে। [বৈরামের তথাকরণ] এই শয়তানকে কারাগারে পাঠিয়ে দাও। কারারক্ষীকে বলবে, প্রতিদিন যেন একশত বেত্রাঘাত করে।

বৈরাম। রক্ষি! [রক্ষীর প্রবেশ।] যাও রক্ষী, একে কারাগারে নিয়ে যাও।

রহমৎ। চমৎকার—চমৎকার নসীব আমার।

[রক্ষীসহ প্রস্থান।

সিকিন্দার। কিন্তু ভাইজান, এই যুদ্ধে আমাদের কে সাহায্য করবে?

হাতেম আলি খাঁর প্রবেশ।

হাতেম। আমি সাহায্য করবো শাহানশাহ।

বৈরাম। কে তুমি?

হাতেম। বান্দার নাম হাতেম আলি খাঁ। ছিলাম বঙ্গেশ্বরের হাবিলদার, কিন্তু চরম অপমানিত হয়ে নোকরীতে ইস্তফা দিয়েছি। এখন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য বাংলার ধ্বংস—হোসেন শাহের কবর।

সিকিন্দার। তাতে তোমার লাভ?

হাতেম। সম্রাটের অনুগ্রহ। আর যুদ্ধে জয় হলে মেহেরবানী করে যদি সাহসপুরের থানাদারী দেন, এ বান্দা বহুৎ খুশী হবে শাহানশাহ।

সিকিন্দার। তুমি নিশ্চয় বাংলার পথঘাট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। কিন্তু তোমায় বিশ্বাস করে যদি আমাদের কোন ক্ষতি হয়?

হাতেম। এ বান্দার শির জামিন।

সিকিন্দার। বহুৎ আচ্ছা! যাও হাতেম আলি খাঁ, বিশ্রাম করগে। এ যুদ্ধে তুমিই হবে আমার প্রধান সহায়।

হাতেম। গ্রহণ করুন সম্রাট এ বান্দার লাখো লাখো সেলাম।

[প্রস্থান।

সিকিন্দার। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। হোসেন শাহের নসীবে এবার ফাটল ধরেছে। এসো ভাইজান, রাজকার্য বুঝে নেবে এসো। আমার এবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে।

বৈরাম। না ভাইসাহেব! তুমিই থাক দিল্লীতে, আমি যাব বাংলা জয় করতে।

সিকিন্দার। উত্তম। তবে বিলম্ব না করে এসো মন্ত্রণা কক্ষে। যুদ্ধের খসড়া প্রস্তুত করতে হবে হাতেম খাঁকে নিয়ে।　　　[প্রস্থান।

বৈরাম। অপদার্থ হোসেন শাহ! তুমি কৌশলে আমাকে বাংলা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে দিয়েছ। কিন্তু এবার আর তোমার রেহাই নেই।

বোরখায় ঢাকা বিজলীবাঈয়ের প্রবেশ।

বিজলী। শাহজাদা!

বৈরাম। কে?

বিজলী। আমি ভূতপূর্ব উজির কুদ্দুস মহম্মদের কন্যা জহরৎ।

বৈরাম। এখানে হঠাৎ কি প্রয়োজন?

বিজলী। আজ আর আপনার কোন কথা মনে নেই। কিন্তু আমি আজও ভুলিনি। কারণ আমি যে ঔরাৎ। একবার দীলের মধ্যে যে পুরুষের তসবীর আঁকা হয়ে যায়, তা আর কোনদিন মুছতে পারি না।

বৈরাম। কি বলছ তুমি?

বিজলী। স্মরণ করে দেখুন তো শাহজাদা! একবার আব্বার সঙ্গে আপনি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আমাকে দেখে সাদি করবেন বলে খোদার কসম খেয়েছিলেন। আর আমাকে বলেছিলেন— জহরৎ, তুমি হবে আমার বেগম। সেই থেকেই মনে মনে আমি আপনাকে খসম ভেবেছি। এই দেখুন আপনার সেই চেনা মুখ। [মুখের পর্দা সরাইল]

বৈরাম। ইনসানাল্লা! বহুৎ খাপসুরৎ! যেন আশমানের বিজলী।

বিজলী। শাহজাদা! আপনি কি আপনার জবান রাখবেন না?

বৈরাম। আলবৎ রাখবো। তোমাকে আমি বেগম বানাবো।

কাছে এসো জহরৎ। [বিজলী অগ্রসর হইতেই তাহাকে ধরিয়া চুম্বনে উদ্যত]

বিজলী। [সরিয়া গিয়া] শাহজাদা! আমি ভারত-সাম্রাজ্ঞী হতে চাই।

বৈরাম। অপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই হবে। আজ শুধু আমাকে একটা—

বিজলী। না, আপনিও অপেক্ষা করুন। আগে আমার দীলের খোয়াব মেটান, আপনি ভারতের সম্রাট হয়ে বসুন দিল্লীর মসনদে।।

বৈরাম। না জহরৎ, তা হয় না। আমি পুরুষ, তাই আমার বাঞ্ছিত লালসা-সামগ্রী হাতে পেয়েও ত্যাগ করতে পারি না। হাত ধর, চল আমার কক্ষে।

বিজলী। চলুন। কিন্তু আগে বলুন, যা জিজ্ঞাসা করছি সত্যি বলবেন ?

বৈরাম। কসম খোদা, তুমি যা জিজ্ঞাসা করবে সত্যি বলব।

বিজলী। আপনি তো বাংলা আক্রমণ করতে চলেছেন। কিন্তু ওই কালাআদমীটা কেন আপনাদের সাহায্য করতে চায় ?

বৈরাম। ও ভেতো বাঙালী। নাম হাতেম আলি খাঁ।

বিজলী। হাবিলদার হাতেম খাঁ? কিন্তু কেন? রহমৎ খাঁ কোথায় ?

বৈরাম। রহমৎ বন্দী!

বিজলী। বন্দী? ওঃ খোদা! [ভাঙিয়া পড়িল]

বৈরাম। চমকে উঠলে কেন? একি, তোমার চোখে পানি?

বিজলী। শাহজাদা! সে যে আমার কলিজার কলিজা, সে যে আমার ভাইজান।

বৈরাম। সেকি! সেও তো বাঙালী।

বিজলী। না। মিথ্যা কথা বলে সে সম্রাটের নোকরী নিয়েছিল, কেবল আপনার সঙ্গে আমার মিলনের যোগসূত্র ঘটিয়ে দিতে।

বৈরাম। না-না, সে আমার বিরুদ্ধে—

বিজলী। সুলতানের কাছে অনেক কথাই বলে সুলতানকে উত্তেজিত করতো। হায় আমার বদনসীব! এই সামান্য কথাটুকু বোঝার মত বুদ্ধিও আপনার মগজে নেই?

বৈরাম। কিন্তু সে তো কোনদিন আমার কাছে তোমার কথা বলেনি।

বিজলী। বলবার অবসর দিলেন কোথায়? তাকে তো কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। ওঃ খোদা!

বৈরাম। কোন চিন্তা নেই, সবার অলক্ষ্যে আমি তাকে মুক্ত করে দেবো। কেউ একথা জানবে না। শুধু তুমি আমার হও। এসো আমার সঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সাহেব আলির বাড়ি

রত্নহার হাতে সাহেব আলির প্রবেশ।

সাহেব। আলেয়া—আলেয়া! কই, কোথায় গেলি রে বেটি?

ভাবনা কাজীর প্রবেশ।

ভাবনা। দাঁড়াও। দাও ওই রত্নহার।

সাহেব। সেকি! জাঁহাপনার দান—

ভাবনা। চোপরাও কমবক্ত! বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা মানায় না। দাও।

সাহেব। না-না, এ আমি দেবো না কাজী সাহেব, কিছুতেই দেবো না।

ভাবনা। দিতে তোমাকে হবেই সাহেব আলি মোল্লা।

সাহেব। না—না।

ভাবনা। মর তবে শয়তান! [অস্ত্রাঘাত]

সাহেব। আঃ খোদা! [পতন]

ভাবনা। খোদা? [রত্নহার লইয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ! জাহান্নামে যা বাঁদীকা বাচ্চা!

ছুটিয়া আলেয়ার প্রবেশ।

আলেয়া। আব্বাজান—আব্বাজান—একি, খুন?

ভাবনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! খুন—মউৎ—খতম। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আলেয়া। আব্বাজান! [সাহেব আলির বুকে পড়িল]

সাহেব। বেটি! আমাকে একটু তুলে ধর। [তুলিল] আঃ—বেটি, তুই এখানে আর থাকিসনে। তুই চলে যা, রমজানের কাছে চলে যা।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

আলেয়া। আব্বাজান! তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে—একি, টলতে টলতে যাচ্ছ কেন বাপজান, দাঁড়াও। [প্রস্থানোদ্যতা]

ভাবনা। দাঁড়াও বিবিজান।

আলেয়া। কাজীসাহেব!

ভাবনা। চিৎকার করো না। শোন, জালিম যখন তোমাকে সাদি করলই না, তখন আমি তোমাকে সাদি করবো। এসো। [হস্তধারণ]

আলেয়া। [চিৎকার করিয়া] কে আছ? বাঁচাও—বাঁচাও, রক্ষা কর—রক্ষা কর।

ভাবনা। কেউ নেই।

জালিম কাজীর প্রবেশ।

জালিম। কিন্তু মানুষ আছে।

আলেয়া। ভাইজান—

ভাবনা। ভাইজান? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

জালিম। একি ভাইসাহেব, তুমি! তোবা—তোবা—তোবা! আমি যাকে বহিন বলেছি, তুমি তাকে বেইজ্জত করতে চাও?

ভাবনা। বহিন? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

জালিম। এখনও বলছি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। নইলে আমিই তোমাকে কবরের পথ দেখিয়ে দেবো।

ভাবনা। তবে তুইই জাহান্নামে যা বেয়াদব! [আক্রমণ ও যুদ্ধ, ভাবনা অস্ত্রচ্যুত হইল]

জালিম। এবার যদি কবরে পাঠাই?

ভাবনা। জালিম!

জালিম। চুপ! ভুলে যাব যে, তুমি আমার বড় ভাই। যে গুনাহ তুমি আজ করেছ, তার একমাত্র শাস্তি—[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

আলেয়া। [বাধা দিয়া] ক্ষমা কর ভাইজান।

জালিম। আলেয়া!

আলেয়া। অপরাধীকে ভুল বোঝবার অবসর দাও। ভুলে যাও কেন—যে উনি তোমার বড় ভাইজান।

জালিম। দেখ—দেখ ভাইসাহেব! একটু আগে যার মুখে তুমি কলঙ্কের কালি মাখাতে চেয়েছিলে, সেই গরীব চাষীর বেটি তোমার জানভিক্ষা চাইছে।

ভাবনা। জালিম!

জালিম। জালিম বলে ডেকে আমার দীলের ভেতর ঘুমিয়ে পড়া শয়তানটাকে আর জাগিয়ে দিও না। আমি ক্ষমা করলেও হয়তো সে তোমাকে রেহাই দেবে না। যাও, দূর হও এখান থেকে। [তরবারি কুড়াইয়া ভাবনাকে দিল]

ভাবনা। [স্বগত] আচ্ছা, এর চরম বদলা আমি নেবোই নেবো, তবে আমার নাম দেওয়ান ভাবনা কাজী।

[প্রস্থান।

আলেয়া। ভাইজান!

জালিম। চোখের পানি মুছে ফেল বহিন। চল আজই তোমাকে আর আব্বাকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাই।

আলেয়া। ভাইজান! আব্বাজানকে দেওয়ান ভাবনা কাজী দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এই দেখ তার খুন।

জালিম। খুন? ওঃ খোদা! এ তুমি কি করলে বহিন? তবু—তবু তুমি ওই শয়তানকে ক্ষমা করলে?

আলেয়া। দুঃখ করে লাভ নেই ভাইজান। এ আমার বদনসীব। দুনিয়ার খেলা বাপজানের শেষ হয়েছে, তাইতো দেওয়ান তাকে খুন করতে পেরেছে। চল—আব্বাজানের কবরে মাটি দেবে চল।

জালিম। শুধু নসীবের দোহাই দিয়ে ছেড়ে দিলে চলবে না বহিন। তাহলে ওই শয়তান আরও কত শত মানুষের বুকে জ্বালিয়ে তুলবে পিতৃশোকের আগুন। তাই এখনই আমরা যাব সুলতানের দরবারে—আব্বাজানের হত্যার কৈফিয়ৎ চাইতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌড়ের দরবার

কথা বলিতে বলিতে রহমৎ ও বিজলীর প্রবেশ।

রহমৎ। কাজটা কিন্তু ভাল করলে না বহিন! কেন তুমি কৌশলে আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে নিয়ে এলে?

বিজলী। ভুলে যাও কেন ভাইসাহেব, তুমি বাঙালী। যুদ্ধের সময় দিল্লীর কারাগারে তোমার বন্দী হয়ে থাকা চলে না। তাই তো আমি বৈরাম লোদীর সঙ্গে অভিনয় করে তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে এলাম বাংলা-মায়ের সাহায্যে।

রহমৎ। কিন্তু আমার জন্যে তুমি ওই শয়তান বৈরাম লোদীর কাছে—

বিজলী। চিন্তা করো না ভাইসাহেব! সত্যিই তো, আমি বাংলার শাহজাদী নই—আমি লাখনৌয়ের খ্যাতনামা বাঈজী বিজলীবাঈ।

রহমৎ। বহিন!

বিজলী। অনেক আগেই আমার ইজ্জৎ বাজারে কাণা-কড়ির দামে বিকিয়ে গেছে। আমার জীবন পাপের মাপকাঠির অনেক উর্দ্ধে। তাই একজন বাঙালীকে রক্ষা করে যদি বাংলা-মাকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারি, সেই হবে আমার জীবনের পরম পুণ্য।

চাঁদ কাজীর প্রবেশ।

চাঁদ। এই যে মেয়েটা! হলিই বা তুই হোসেনের কুড়িয়ে পাওয়া বহিন; তবুও তো তুই আমাকে বাপজান বলে ডাকিস রে বেটি! কোথায় ছিলি এতদিন? আমি খুঁজেই অস্থির। আমিনাও জানে

না, হোসেনও বলে না। এ লোকটা কে রে বেটি? ওঃ জামাই হবে বুঝি? হেঃ-হেঃ-হেঃ!

রহমৎ। কি বলছেন আপনি? ও যে আমাকে ভাইজান বলেছে।

চাঁদ। আরে বাপু, কোন চিন্তা নেই। আমি হোসেনকে বলে সব ঠিক করে দেবো'খন। তাছাড়া ইসলাম ধর্মে ভাই-বহিন ছাড়া আবার শাদি হয় নাকি?

বিজলী। কিন্তু আপনি—

চাঁদ। তুই থাম তো দেখি বেটি। আমার তো দামাদ হবে, আমিনার হবে বোনাই—একটু ভাল করে যাচাই করতে হবে। তা হ্যাঁ হে বাপু! ঘোড়ায় চড়তে জানো? হাতিয়ার ধরতে জানো? রাজনীতি বোঝ?

হোসেনের প্রবেশ।

হোসেন। কাকে রাজনীতি বোঝাচ্ছেন?

চাঁদ। এই ছেলেটা আমার দামাদ হবে কিনা, তাই একটু যাচাই করছি। কেমন মানাবে বল দেখি?

রহমৎ। বন্দেগী হজরৎ!

হোসেন। রহমৎ খাঁ! দিল্লী ছেড়ে সহসা—

রহমৎ। আমি দিল্লীশ্বরের নোকরীতে ইস্তফা দিয়ে এসেছি।

চাঁদ। তুমি দিল্লীওয়ালা? আরে বাপ! তবে দেখ হোসেন, দিল্লীওয়ালা হলেও ছেলেটা ভাল। ওকে যেন কোতল-টোতল করো না।

হোসেন। এই সময় নোকরীতে ইস্তফা দিলে আর সিকিন্দার লোদী তাই মেনে নিল?

বিজলী। না ভাইসাহেব। মেহেরবানী করে তিনি রহমৎ খাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন, আমি প্রয়োজন বোধে কৌশলে এই বাঙালী জোয়ানকে মুক্ত করে এনেছি।

হোসেন। ভালই করেছ। কিন্তু আমি তোমাকে দিল্লী পাঠিয়েও বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম। তারা যদি তোমাকে গুপ্তচর বলে বুঝতে পারত, তাহলে সুলতান হোসেন শাহ তার বহিনকে আর ফিরে পেত না।

বিজলী। ভুলে যান কেন ভাইসাহেব যে আমি সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের বহিন।

রহমৎ। জাঁহাপনা! আমি কি বাংলার সেনাদলে স্থান পেতে পারি না?

হোসেন। কেন পারবে না ভাই! তুমিও তো বাংলা-মায়েরই সন্তান।

রহমৎ। কিন্তু আমি যে নিমকহারাম।

হোসেন। নিমকহারাম তারা, যারা দেশমায়ের দুর্দিনে দূরে দাঁড়িয়ে দুষমনের সঙ্গে আনন্দের হাসি হাসে। এ যুদ্ধে তুমিই হবে আমার সিপাহশালার। [অস্ত্রদান]

চাঁদ। এ বড় ভালই হলো। যাই, আমি আদিনাকে সংবাদ দিইগে। হেঃ-হেঃ-হেঃ! তবে দেখ বাপু, লড়াই শেষ হলেই কিন্তু আলেয়া বেটিকে তোমায় সাদি করতে হবে।

[প্রস্থান।

রহমৎ। বঙ্গেশ্বরের দান আমি মাথায় তুলে নিলাম। আর দীন-দুনিয়ার মালিক মেহেরবান খোদার নামে কসম খেয়ে ওয়াদা দিলাম, যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু খুন থাকবে, ততক্ষণ রহমৎ খাঁ দুষমনের

সাক্ষী আছে? কেবলমাত্র ফরিয়াদীর কথায় আসামীর বিচার হয় না জনাব।

হোসেন। সত্যিই তাই। আচ্ছা আলেয়া! তোমার আর্জির স্বপক্ষে আর কোন সাক্ষী আছে?

জালিমের প্রবেশ।

জালিম। আছে জনাব।

হোসেন। থানাদার জালিম কাজী! তুমিও কি দেওয়ান সাহেবের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ এনেছ?

জালিম। না জাঁহাপনা! আমি এই ঘটনার সামান্য সাক্ষীমাত্র।

হোসেন। বহুতাচ্ছা! বল তুমি কি দেখেছ।

জালিম। জাঁহাপনা, আমি থানায় যাওয়ার পথে সাহেব আলির বাড়িতে মরণ-চিৎকার শুনে বিনা এত্তেলাতেই প্রবেশ করে দেখলাম, একরাশ তাজা খুন। আর সেই খুনের দরিয়ার ওপর দাঁড়িয়ে একহাতে রক্তমাখা হাতিয়ার নিয়ে জনাবের দেওয়ান ভাবনা কাজী আলেয়ার ইজ্জত হরণে উদ্যত। তখন বাধ্য হয়ে আমি দেওয়ান সাহেবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। আর সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেওয়ান সাহেব পলায়নের পর শুনলাম সাহেব আলিকে খুন করেছে ভাবনা কাজী।

ভাবনা। জাঁহাপনা! গোস্তাকি মাফ করবেন। ওই সাহেব আলির বেটি আলেয়ার সঙ্গে জালিমের গোপন আসনাই হয়। একথা জানতে পেরে সাহেব আলি তার বেটির সঙ্গে সাদি দিতে নারাজ হওয়ায় জালিম কাজী নিজের হাতে তাকে খুন করেছে মেহেরবান!

জালিম। অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা হজরৎ। আলেয়া আমার বহিন,

প্রয়োজনে ওকে আমি সেলাম জানাতে পারি, কিন্তু সাদি করতে পারি না।

ভাবনা। ওই বেয়াদবের কথা বিশ্বাস করবেন না জাঁহাপনা। বরং সাহেব আলির লাশ তদন্ত করে দেখুন, সেখানে কার খঞ্জর বিদ্ধ হয়েছে।

জালিম। লাশ তো পাওয়া যাবে না জাঁহাপনা। তার আত্মীয়রা তাকে কবর দিয়ে দিয়েছে।

হোসেন। করেছ কি—করেছ কি জালিম কাজী? লাশ কবরে পাঠিয়ে সুলতানের কাছে দরবার চাইতে এসেছ?

আলেয়া। জাঁহাপনা!

হোসেন। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তোমার পিতৃহত্যার বিচার হলো না মা।

আলেয়া। হজরত!

জালিম। চোখের পানি মুছে ফেল বহিন। এ দরবারে বিচার হবে না। চল আমরা খোদার দরবারে মোনাজাত জানাই।

আলেয়া। চল ভাইজান। [হোসেনকে] তাহলে আমি আসি জাঁহাপনা! সেলাম—সেলাম।

[প্রস্থান।

জালিম। আমিও যাই হজরত! আর যাবার বেলায় বলে যাই জাঁহাপনা! প্রয়োজনে কালকেউটেকে বিশ্বাস করবেন, কিন্তু মালিক, আমার এই ভাইসাহেবকে কোনদিন বিশ্বাস করবেন না।

[প্রস্থান।

ভাবনা। হুঁশিয়ার কমবক্ত জালিম কাজী!

হোসেন। দেওয়ান সাহেব! ভুলে যাবেন না, এটা দরবার।

জালিম কাজী আপনার ভাই হলেও, সে সাহসপুরের থানাদার। আর সে দরবারে এসেছে সাক্ষী হয়ে। তাকে যদি শাসন করতে হয়, নিজের এক্তিয়ারে গিয়েই করবেন—এখানে নয়।

ভাবনা। জাঁহাপনা—

হোসেন। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আসন্ন যুদ্ধে যদি আমরা জয়ী হই, তবে আপনাকে আমি একটা জায়গীর খেলাৎ দেবো।

ভাবনা। জনাব—

হোসেন। স্বতন্ত্রভাবে চালিত হবার জন্যে আপনাকে পাঠাব আমি দীঘলহাটির রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যে।

[প্রস্থান।

ভাবনা। দী-ঘ-ল-হা-টি ? হাঃ-হাঃ-হাঃ ! শয়তান জালিম কাজী ! দেখব কেমন করে তুমি আলেয়াকে রক্ষা কর। যেমন করেই হোক, আলেয়াকে আমি করায়ত্ত করবোই করবো। তবেই আমার নাম ভাবনা কাজী।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

সোনারগাঁ ময়দান—রণস্থল।

[নেপথ্যে "জয় সম্রাট সিকিন্দার লোদীর জয়!"]

যুদ্ধরত হাতেম আলি ও জালিম কাজীর প্রবেশ।

জালিম। বেইমান হাতেম আলি খাঁ! তুমি আমাদেরই নিমকের হালাল হয়ে বিপক্ষদলে যোগ দিয়েছ! শত্রুর হাতে নিজের জন্মভূমি-মাকে তুলে দিতে চাও বেইমান!

হাতেম। খামোশ বেয়াকুব! হয় জান দাও, না হয় জান বাঁচাও।
[উভয়ের যুদ্ধ ও হাতেমের অস্ত্রচ্যুত]

জালিম। জাহান্নামে যা নিমকহারাম। [হাতেমকে অস্ত্রাঘাত]

সহসা ভাবনা কাজী প্রবেশ করিয়া জালিমকে ছুরিবিদ্ধ করিল।

জালিম। ওঃ খোদা!

হাতেম। হ্যাঁ-হ্যাঁ, খোদা আমাদের ঠিকই বিচার করেছেন।
[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

ভাবনা। একি জালিম! আমি দুষমন ভেবে তোকেই খুন করলাম!

জালিম। ঠিক করেছ ভাইসাহেব, তুমি ঠিকই করেছে। আমি তোমার পথের কাঁটা। আমায় সরিয়ে দিয়ে তুমি ভালই করেছ।

ভাবনা। জালিম!

জালিম। ভাইসাহেব! তোমার গুনাহের বোঝা আমি আর সইতে পারছিলাম না। তাইতো খোদা আমার ছুটির পরোয়ানা দিয়েছেন। আমার জান দিয়ে তোমার গুনাহের শেষ করে গেলাম। এবার মানুষ হও ভাইসাহেব, বাংলা আর বাঙালীকে চিনতে শেখ। [প্রস্থানোদ্যত]

ভাবনা। জালিম!

জালিম। আজ বিশ দিন ধরে যুদ্ধ চলছে। আমরা ক্রমেই জয়ের নিশান হাতে এগিয়ে চলেছি। ওই সম্রাটের সৈন্যদল ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে। এই সময় তুমি আমাকে ছুটি দিলে ভাইসাহেব! জয়ের আনন্দটুকুও ভোগ করতে দিলে না?

ভাবনা। জালিম!

[দূরে আজান ধ্বনি শোনা গেল।]

জালিম। ওই দূরে আজান ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ওই সুর শুনতে শুনতে কবরের তলায় ঘুমিয়ে পড়বো। আর অন্ধকার কবরের অতল গহ্বর থেকে মেহেরবান খোদাকে ডেকে বলব—আমার ভাইসাহেবের সমস্ত গুনাহের ভার তুমি আমার মাথায় চাপিয়ে দাও মালিক, আমার মাথায় চাপিয়ে দাও।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

ভাবনা। জালিম—থাক, যে গেছে—সে যাক। এই যুদ্ধে যেমন করেই হোক ওই কাফের হোসেনকে মসনদচ্যুত করতেই হবে। কিন্তু সিকিন্দার লোদী যদি চিন্তা করে থাকে যে, বাংলার মসনদকে সেই করায়ত্ত করবে, তাহলে তার সে খোয়াব কি বাস্তবে পরিণত হবে? না-না, যতক্ষণ ভাবনা কাজী জিন্দা আছে, ততক্ষণ সিকিন্দার লোদী কেন, দুনিয়ার কোন শক্তিরই সাধ্য নেই বাংলার মসনদকে করায়ত্ত করতে পারে। যদি প্রয়োজন হয়, আমার তাজা খুনে বাংলার মাটি

লাল করে দেবো, তবু দেশের স্বাধীনতা বিজাতি বিদেশীর পায়ে বিকিয়ে দেবো না। না—না, কিছুতেই না। [প্রস্থান।

যুদ্ধরত রহমৎ ও বৈরাম লোদীর প্রবেশ।

বৈরাম। নিকমহারাম রহমৎ খাঁ—

রহমৎ। হুঁশিয়ার দিল্লীওয়ালা! ওই দেখ, কবর তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

বৈরাম। আমাকে নয়, তোমাকে। [উভয়ের প্রচণ্ড যুদ্ধ]

রহমৎ। অস্ত্রত্যাগ কর বৈরাম লোদী!

বৈরাম। রহমৎ খাঁ! তোমার সর্বাঙ্গে খুনের আলপনা। কেন বিপক্ষে যোগ দিয়ে নিজের জান খোয়াবে বেয়াকুব?

রহমৎ। খামোশ! শয়তান! আমি জান দেবো, তবু বেঁচে থেকে তোমাদের জয় সহ্য করতে পারবো না।

বৈরাম। তবে জাহান্নামে যাও বাঁদিকা বাচ্চা! [উভয়ের যুদ্ধ, রহমতের পরাজয়, বৈরাম কর্তৃক অস্ত্রাঘাত]

রহমৎ। আঃ—খোদা!

বৈরাম। খোদা? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[নেপথ্যে—"জয় বাংলা-মায়ের জয়! জয় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের জয়!"]

রহমৎ। আঃ খোদা! আমি কবরে যাই দুঃখ নেই। তবু জবান বজায় রাখলাম। মৃত্যু দিয়েও বাংলা-মায়ের জয়ধ্বনি শুনে গেলাম। [প্রস্থান।

বৈরাম। সত্যিই কি ভারতসম্রাট পরাজিত হলো? আমারও সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। তাইতো এখন আমি কি করি?

পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। কবরে যাও শয়তান! [উভয়ের যুদ্ধ, বৈরামের তরবারি হস্তচ্যুত] অস্ত্র তুলে নাও শয়তান! আমি তোমাকে কুকুরের মত জবাই করবো না। অস্ত্রাঘাতে অস্ত্রাঘাতে তোমাকে টুকরো টুকরো করে বাংলার সীমান্তের বাইরে ছড়িয়ে দেবো।

[যুদ্ধরত উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে—জয় বাংলা মায়ের জয়! জয় হোসেন শাহের জয়!]

ছুটিয়া সিকিন্দার লোদীর প্রবেশ।

সিকিন্দার। পরাজয়—পরাজয়, সম্রাট সিকিন্দার লোদীর পরাজয়। একে একে সব সেনাদল ছত্রভঙ্গ। জানের ভয়ে সকলে পলায়ন করছে। পুনঃ পুনঃ বাংলার জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অসংখ্য বাঙালী জান দিয়েও রক্ষা করলো তাদের দেশ-জননীকে। ওরে কে আছিস? শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দে, সন্ধির নিশান তোল। আজ ভেতো বাঙালীদের কাছে ভারতসম্রাট সিকিন্দার লোদী পরাজিত।

[প্রস্থান।

ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত বৈরাম লোদীর পুনঃ প্রবেশ।

বৈরাম। কে—কে ওই ছায়ামূর্তি? কেন ও আমায় অনুসরণ করেছে? ও কি চায়? [বিভীষিকা দেখিয়া] ওকি, কারা হাসছে? একি, কারা কাঁদছে? কারা সমস্বরে চিৎকার করে বলছে বেয়াদব—বেইনসাফ—বেতমিজ বৈরাম লোদী, হুঁশিয়ার! কারা—কারা, ওরা কারা? কারা বলছে কবর আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে? ওরা কারা?

ইস! চারিদিকে শুধু রক্ত, মাংসপিণ্ডের পচা দুর্গন্ধময় পাহাড়—নরমুণ্ডের মিনার—হাড্ডির মেলা! কি সাংঘাতিক দৃশ্য! শৃগাল-শকুনের দল মহানন্দে নৃত্য করছে আর খুনের দরিয়ায় সাঁতার দিচ্ছে! না-না, এ আমি সহ্য করতে পারছি না—সহ্য করতে পাচ্ছি না! তার চেয়ে যাই—পালাই এখান থেকে। [অগ্রসর হইতে গিয়া] একি, কবর—চারিদিকে অতলস্পর্শী কবরের আহ্বান! ইস! ওকি, কারা—কারা কবরের মধ্য থেকে হাত বাড়িয়ে আমায় ডাকছে? কারা বলছে—শয়তান বৈরাম লোদী, তুমি অকালে বহু জান ধ্বংস করেছ—বহু ঔরতের ইজ্জৎ নিয়ে তাদের অকালে কবরে পাঠিয়েছ। আজ আর তোমার রেহাই নেই। ওরা কারা? না-না, আমি এত শীগগির কবরে যাব না—কিছুতেই না।

গোবিন্দর প্রবেশ।

গোবিন্দ। কবরে তোমার যেতেই হবে শয়তান। [বৈরামের বক্ষে অস্ত্রাঘাত]

বৈরাম। আঃ—খোদা!

গোবিন্দ। চুপ শয়তান! এখানে চিৎকার করে খোদাকে ডেকো না। এখুনি আমার শহীদ ভাইদের ঘুম ভেঙে যাবে! অনেক কষ্টে দুঃখিনী বাংলা-মা তাদের ঘুম পাড়িয়েছে।

বৈরাম। আঃ—আঃ—কে, তুমি কে?

গোবিন্দ। আমি তোমার যম। মনে পড়ে বৈরাম, তোমার পিতা বহলুল লোদীর প্রধান তহশীলদার বাঙালী গোবিন্দ দাসের কথা?

বৈরাম। গোবিন্দ দাস!

গোবিন্দ। চুপ! তুমি—তুমিই আমার সুখের সংসার তছনছ করেছ,

তুমিই আমার বুকের পাঁজর খুলে নিয়েছ, তুমিই আমার চোখের মণি উপড়ে নিয়েছ।

বৈরাম। গোবিন্দ দাস! আঃ—আঃ! একটু পানি—

গোবিন্দ। পানি! পানি আমি তোমায় দেবো শয়তান, তার আগে বল আমার গীতা কোথায়?

বৈরাম। তাকে আমি—লাখনৌতে এক বাঈজীর কাছে বিক্রী করে দিয়েছিলাম। মনে হয় আজ আর সে বেঁচে নেই।

বিজলীর প্রবেশ।

বিজলী। না শয়তান। তোমার রক্তে পা ধোবার জন্যে আজও আমি বেঁচে আছি। [বৈরামকে পুনঃ অস্ত্রাঘাত]

বৈরাম। আঃ খোদা! কে? গীতা? আঃ—আঃ—মালিক! আঃ!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

গোবিন্দ। গীতা! আমার গীতাঞ্জলি!

বিজলী। আমায় স্পর্শ করো না স্বামী। আমি কলঙ্কিনী বাঈজী।

গোবিন্দ। সকলের কাছে বাঈজী হলেও, আমার কাছে তুমি গঙ্গাজলের মত পবিত্র, গীতার মত শুদ্ধ। এসো গীতা, আবার তোমাকে নিয়ে গাইব আমি আমার সেই গীত-গোবিন্দের পদাবলী। আজ এই শহীদনগরের অসংখ্য শহীদের রক্তে ভেজা মাটিতে দাঁড়িয়ে আবার তোমায় স্ত্রী বলেই স্বীকার করে নিলাম।

[বিজলী মাথায় কাপড় দিয়া গোবিন্দকে প্রণাম এবং

[উভয়ে হাত ধরিয়া প্রস্থান।

———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গৌড়ের দরবার

হোসেন ও ভাবনা কাজীর প্রবেশ।

হোসেন। দেওয়ান ভাবনা কাজী! বল যুদ্ধের কি সংবাদ?

ভাবনা। সংবাদ শুভ জাঁহাপনা। আমাদের জয় অনিবার্য। সম্রাটের সৈন্যদল ভয়ে সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে। আমাদের সৈন্যরা অমিত বিক্রমে এগিয়ে চলেছে।

হোসেন। তারপর?

ভাবনা। হুকুম আলি, রামুঠাকুর, রহমৎ খাঁ, জালিম কাজী জান দিয়ে বাংলার ইজ্জত রক্ষা করেছে মেহেরবান।

হোসেন। ও: খোদা! আর পুরন্দর খাঁ?

পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। পুরন্দর খাঁ হাজির জাঁহাপনা।

হোসেন। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা—

পুরন্দর। যুদ্ধে জয় আমাদের হয়েছে। কিন্তু তার মাশুল দিতে আমাদের বহু সেনানায়ক জীবনদান করেছেন মেহেরবান।

ভাবনা। খোদা! এই বাংলা-মায়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে কত রক্ত তুমি নেবে? বল—বল, আমিও আমার কলিজার রক্ত ঢেলে দিই দেশের স্বাধীনতা রক্ষায়।

হোসেন। দুঃখ করো না দেওয়ান সাহেব! এ যুদ্ধে যারা জীবন দিয়েছে, তাদের স্মৃতির উদ্দেশে সোনার বাংলায় তৈরী হবে শহীদ-নগর।

পুরন্দর। জাঁহাপনা! সিকিন্দার লোদী শ্বেত নিশান উড়িয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে দূত প্রেরণ করেছে।

হোসেন। কই, কোথায় সিকিন্দার লোদীর দূত?

দূতবেশী সিকিন্দার লোদীর প্রবেশ।

সিকিন্দার। বঙ্গেশ্বরের জয় হোক।

পুরন্দর। বল দূত, কি তোমার বক্তব্য?

সিকিন্দার। ভারতসম্রাট সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে বঙ্গেশ্বরকে এক পত্র দিয়েছেন।

ভাবনা। ভারতসম্রাট তো বঙ্গেশ্বরের কোন কথারই মর্যাদা রাখেন না।

সিকিন্দার। এবার তিনি নিশ্চয়ই রাখবেন।

হোসেন। সন্ধিপত্রের উদ্দেশ্য কি মহামান্য সম্রাট বাহাদুর?

ভাবনা। সম্রাট বাহাদুর!

হোসেন। হ্যাঁ দেওয়ান সাহেব। ওই সামান্য দূতের পরিচ্ছদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন ভারতের অসামান্য ভাগ্যবিধাতা সম্রাট সিকিন্দার লোদী।

সিকিন্দার। বঙ্গেশ্বর!

হোসেন। ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করুন শাহেনশাহ। সকলের চোখকে ফাঁকি দিলেও, আপনি আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না।

সিকিন্দার। সত্যিই আমি আপনার দূর-দৃষ্টির প্রশংসা করি সুলতান

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাহাদুর। এই নিন, গ্রহণ করুন আমার স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র। আজ এই বাংলাদেশের সরেস জমিনে দাঁড়িয়ে আমি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছি, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন, আর দিল্লীর মিত্ররাজ্য। যে-কোন সময়ে যে-কোন ভাবে ভারতসম্রাট বাংলাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে।

হোসেন। তাই যদি হয়, বাংলাও ভারতকে সাহায্য করতে সদাই তৈয়ার থাকবে সম্রাট।

সিকিন্দার। আজ আমি আসি। যাওয়ার আগে—মহামান্য বঙ্গেশ্বর আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কুসী খান বাহাদুর! দিল্লী ফেরার আগে "পরাজিত ভারতসম্রাট" আপনাকে জানাচ্ছে আপনার জয়ের অভিনন্দন। ভারত-বাংলা মৈত্রী জিন্দাবাদ!

[উভয়ে সেলাম বিনিময় ও সিকিন্দারের প্রস্থান।

হোসেন। ভারত-বাংলা মৈত্রী জিন্দাবাদ!

সকলে। জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ!